অনন্ত সম্বরে

হুমায়ূন আহমেদ

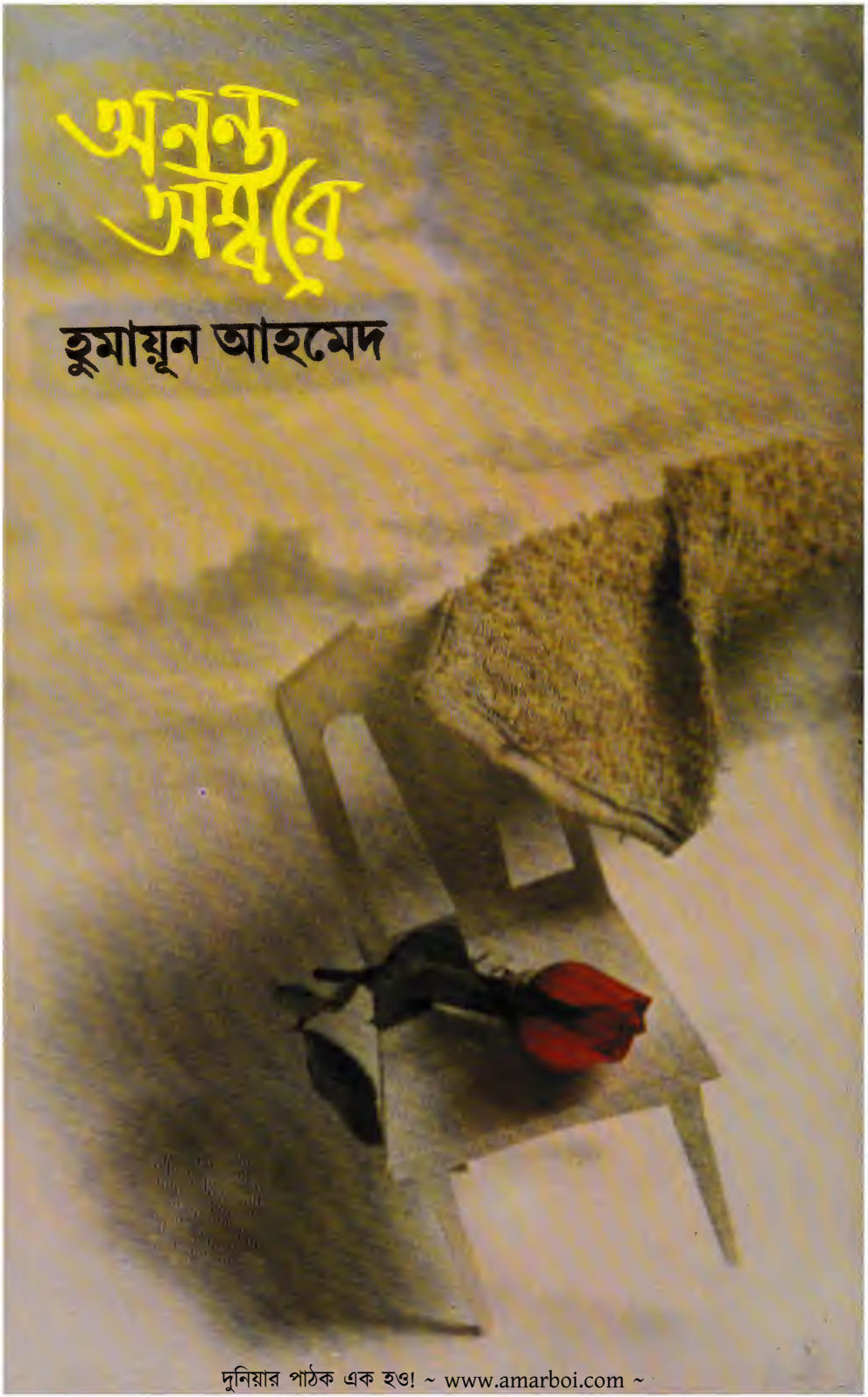

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনন্ত অম্বরে

হুমায়ূন আহমেদ

কাকলী প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©
লেখক

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

নবম মুদ্রণ
ডিসেম্বর ২০১৭
অষ্টম মুদ্রণ
নভেম্বর ২০১৪
সপ্তম মুদ্রণ
জানুয়ারি ২০১২
ষষ্ঠ মুদ্রণ
জুলাই ২০০৭
পঞ্চম মুদ্রণ
জুলাই ১৯৯৯
চতুর্থ মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ১৯৯৭
(কাকলী প্রকাশনীর প্রথম প্রকাশ)
প্রথম প্রকাশ
১লা জানুয়ারি ১৯৯২

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

কম্পোজ
সূচনা কম্পিউটার্স
৪০/৪১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এঞ্জেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা ১১০০

মূল্য ১২০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-93100-5-1

ঘরে বসে বই পেতে অর্ডার করুন : ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১ হট লাইন ১৬২৯৭
অথবা লগ অন করুন : http://rokomari.com/kakali

আমেরিকায় পরিবেশক ॥ মুক্তধারা, জ্যাকশন হাইটস্, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ॥ সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
জার্মান পরিবেশক ॥ স্টেভেনজার গাটান, ৬৩ ব্রুল, জার্মান
সুইডেন পরিবেশক ॥ ভাস্‌বে, স্টকহোম, সুইডেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

জন্ম ভবঘুরে

অধ্যাপক আলতাফ হোসেন

অপ্রিয়বরেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

I have wished a bir[illegible] fly away,
And not sing by my house all day ;
And of course there must be something wrong
In wanting to silence any song.

Robert Frost (A minor bird)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাকলী প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের বইসমূহ

দ্বৈরথ
হোটেল গ্রেভার ইন
সমুদ্র বিলাস
গৌরিপুর জংশন
আমার ছেলেবেলা
ভূত ভূতং ভূতৌ
গল্প সমগ্র
নি
স্বনির্বাচিত উপন্যাস
কোথাও কেউ নেই
জনম জনম
কিশোর সমগ্র
তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে
অনন্ত নক্ষত্র বিথী
এই আমি
আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই
সকল কাঁটা ধন্য করে
কবি
অনন্ত অম্বরে
গৃহত্যাগী জোছনা
হিমুর দ্বিতীয় প্রহর
আমার প্রিয় ভৌতিক গল্প (সম্পাদনা)
মীরার গ্রামের বাড়ি
আঙুল কাটা জগলু
পঞ্চকন্যা
মৃন্ময়ীর মন ভালো নেই
বাদল দিনের দ্বিতীয় কদম ফুল
প্রিয় ভয়ংকর
মিসির আলি UNSOLVED
নলিনী বাবু B.Sc
একটি সাইকেল এবং কয়েকটি ডাহুক পাখি
দাঁড়কাকের সংসার কিংবা মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
হুমায়ূন আহমেদের কথামালা
শ্রেষ্ঠ মিসির আলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার আপন আঁধার

তীব্র যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙল। মনে হল সারা গায়ে কাঁটা ফুটে গেছে। নির্ঘাত কোন দুঃস্বপ্ন। ইদানীং ভয়ংকর সব দুঃস্বপ্ন দেখছি। আমি চোখ মেলে দেখি — দুঃস্বপ্ন নয়, আসলেই কাঁটা ফুটেছে। বিছানাময় গোলাপ ফুল। পাশ ফিরতেই গায়ে গোলাপের কাঁটা বিঁধল। ব্যাপার বুঝতে বেশি সময় লাগল না। আজ আমার জন্মদিন। আমার কন্যারা তাদের উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে বিছানাময় কাঁটাসুদ্ধ গোলাপ বিছিয়ে রেখেছে। ফুলের কাঁটাই বিঁধেছে। ফুলশয্যা সবসময় আনন্দময় নয়।

আমি আবার চোখ বন্ধ করে ফেললাম। এখন জেগে উঠা যাবে না। আমার কন্যারা নিশ্চয় জাগাবার জন্যেও কোন বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছে। ওদের বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। কাঁটার ঘা শরীরে নিয়ে গভীর ঘুমের ভান করলাম।

বিকট শব্দে রেকর্ড প্লেয়ার বেজে উঠলো। এই হচ্ছে আমাকে জাগাবার কৌশল। কয়েকদিন ধরে যে গানটি বাজাচ্ছি কন্যারা সেই গানটি ফুল ভল্যুমে দিয়ে দিয়েছে। কানের পর্দা ফেটে যাবার অবস্থা। সুচিত্রা মিত্র আকাশ ফাটিয়ে গাইছেন,

"পাখি আমার নীড়ের পাখি
অধীর হল কেন জানি
আকাশ কোণে যায় শোনা কি
ভোরের আলোর কানাকানি।।"

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। তিন কন্যা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো —"হেপি বার্থ ডে!" বড় কন্যার হাতে একটা ট্রে। সেই ট্রেতে একটা কাপ। কানায় কানায় ভর্তি চা। চায়ে দুধের সর ভাসছে। মনে হচ্ছে কন্যারা তাদের সমস্ত প্রতিভা ব্যয় করে চা বানিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বিছানায় গোলাপ দেখে বিস্মিত হবার ভান করলাম, আমার প্রিয় গানটি বাজছে দেখে মহা আনন্দিত হবার ভান করলাম। ওদের বানানো হিমশীতল সরবত সদৃশ চা মুখে দিয়ে তৃপ্তির ভান করলাম। ছোট মেয়ে বলল, আব্বু, তোমার কি খুব আনন্দ হচ্ছে?

আমি বললাম, হচ্ছে। এত আনন্দ হচ্ছে মনে হয় চোখে পানি এসে যাবে।

'আমাদেরো খুব আনন্দ হচ্ছে। কারণ আজ আমরা কেউ স্কুলে যাচ্ছি না। সারাদিন ঘরে থাকব।'

'খুব ভাল কথা।'

'আজ আমরাই তোমার জন্য রান্না করব।'

'তোমরা কি রান্না জান?'

'না, জানি না — মা দেখিয়ে দেবে।'

'খুব ভাল।'

'আমাদের চা কেমন লাগল বাবা?'

'অসাধারণ লাগল। মনে হচ্ছে পৃথিবীর সেরা চা খাচ্ছি।'

'আরেক কাপ বানিয়ে নিয়ে আসব?'

'না, আর আনতে হবে না।'

'জন্মদিনে তোমার জন্য আমরা উপহার কিনেছি। শার্ট কিনেছি।'

'বাহ্ বাহ্ — কোথায়?'

তিন কন্যার কিনে আনা উপহার গায়ে দিলাম। পৃথিবীর সমস্ত মেয়েরাই মনে করে তাদের বাবা বিশালকায় একজন মানুষ। আমার মেয়েরাও যে তার ব্যতিক্রম না তাদের কেনা শার্ট গায়ে দিয়ে পরিষ্কার বোঝা গেল। শার্ট পাঞ্জাবীর চেয়েও লম্বা। কাঁধের ঝুল নেমে এসেছে কনুই-এ।

মেজো মেয়ে শংকিত গলায় বলল, শার্টটা কি তোমার একটু বড় বড় লাগছে?

'না তো। গায়ে খুব ভাল ফিট করেছে। আজকাল লম্বা শার্ট পরাই ফ্যাশন।'

হাজী সাহেবের লম্বা কুর্তার মত শার্ট গায়ে দিয়ে বারান্দায় এসে দেখি মেঝেময় ভাঙা কাচের টুকরা। ফুলদানিতে ফুল রাখতে গিয়ে কন্যারা দুটো ফুলদানি ভেঙেছে। কাজের মেয়েকে ভাঙা কাচ সরাতে দেয়া হচ্ছে না কারণ এই বিশেষ দিনে আমার তিন কন্যাই না-কি ঘরের সব কাজ করবে।

বারান্দায় এসে বসলাম। রবীন্দ্র সংগীত বন্ধ হয়েছে বলে খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছি। দিনের শুরুতে রবীন্দ্র সংগীত শুনতে আমার ভাল লাগে না। এক কাপ চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। বলার সাহস পাচ্ছি না। বলামাত্রই তিনজন ছুটে যাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্নাঘরে। আগুন-টাগুন ধরিয়ে একটা কাণ্ড করবে।

মেজো মেয়ে বলল, বাবা, তোমার কেমন লাগছে?

'খুব ভাল লাগছে মা।'

'আনন্দ হচ্ছে?'

'অসম্ভব আনন্দ হচ্ছে।'

'তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না।'

আমি আনন্দিত হবার অভিনয় করলাম, অভিনয় খুব ভাল হল না।

বড় মেয়ে বলল, বাবা গান দেব?

'গান থাক মা।'

'তোমার সব প্রিয় গান ক্যাসেট করে রেখেছি।'

'তাহলে দাও।'

প্রথম গানটি কি কাকতালীয় ভাবেই মিলে গেল — অরুন্ধতী হোম গাইছেন,

"সখী বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা।
একি আর ভাল লাগে?"

আচ্ছা, আজ আমার হয়েছেটা কি? এত চেনা গান অচেনা লাগছে কেন? কত অসংখ্যবার এই গান শুনেছি, কই কখনো তো এত বিষণ্ন বোধ করি নি? আজ কেন প্রথমবারের মতো মনে হচ্ছে — বেলা তো চলেই গেল। হাসি-খেলায় বেলা পার করে দিলাম। আর তো ভালো লাগছে না।

কেউ যেন কানের কাছে গুনগুন করে বলছে — না চাইতেই তুমি অনেক পেয়েছ। এই জীবনে তুমি দেখেছ ৫১৬টি ভরা পূর্ণিমা। তুমি পার করেছ ৪৩টি বর্ষা। এত সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

বাবা-মা'র যে ভালোবাসায় আমার জন্ম, তাতে মনে হয় কোনো খাদ ছিল না। দীর্ঘ ৪৩ বছরে একদিনের জন্যেও আমার মনে হয়নি বৃথাই এই পৃথিবীতে জন্মেছি। প্রচণ্ড দুঃসময়েও বেঁচে থাকার আনন্দ অনুভব করেছি। বৈশাখ মাসে যখন আকাশ অন্ধকার করে কালবোশেখী আসে, তখন মনে হয়, কি ক্ষতি ছিল পৃথিবীটা যদি আরেকটু কম সুন্দর হত। এত সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যাব কি করে?

অয়োময়ের জন্যে গান লিখতে গিয়ে লিখেছিলাম, "আমার মরণ চাঁদনি পহর রাইতে যেন হয়।" আজ মনে হচ্ছে ভুল গান লেখা হয়েছে, ভুল প্রার্থনা। চাঁদনি পহর রাতে আমি মরতে পারব না। নতুন গান লিখতে হবে। প্রার্থনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানাতে হবে যেন ভরা জ্যোৎস্নায় সেই বিশেষ পাল্কি আমার দুয়ারে এসে না থামে।

একবার নর্থ ডাকোটা থেকে গাড়িতে করে সিয়াটল যাচ্ছি, পথে মন্টানায় রাত্রিযাপনের জন্য থামলাম। চারদিকে পাহাড়ঘেরা সমতলভূমি। বাচ্চাদের হোটেলে শুইয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। রূপার থালার মত প্রকাণ্ড চাঁদ উঠেছে। অপূর্ব জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না ভেঙে আলো-আঁধারের অপূর্ব নকশা তৈরি হয়েছে পাহাড়ের গায়ে। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মহান সৌন্দর্যের মুখোমুখি হলে এক ধরনের তীব্র হাহাকার মনের ভেতরে আপনা-আপনি জন্মায় — সুন্দরের উৎস সন্ধানে ব্যাকুলতা জাগে।

সৌন্দর্য দেখে দেখে জীবন কাটিয়ে দিলাম, এই সুন্দরের জন্ম কোথায়, কোন দিন তার খোঁজ করলাম না। এই জীবনে সম্ভব হল না — হায়! অন্য কোন জীবনও তো নেই, থাকলে চেষ্টা করা যেত।

ছোটবেলায় আমাদের মীরাবাজারের বাসায় একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ বেড়াতে আসতেন। আমার বাবা-মা দু'জনই ছিলেন তাঁর ভক্ত। এই চিরকুমার মানুষটি না-কি মহাপুরুষ পর্যায়ের। ঘুরে বেড়াতেন খালি পায়ে, অতি তুচ্ছ বিষয়ে হা-হা করে হাসতেন। তখন আমার ধারণা হল — মহাপুরুষদের খালি পায়ে থাকতে হয়, অকারণে হাসতে হয়। এক সন্ধ্যার কথা-তিনি বেড়াতে এসেছেন। মা বললেন, আপনি খুব ভালো দিনে এসেছেন, আমার কাজলের জন্যে একটু প্রার্থনা করুন। আজ কাজলের জন্মদিন।

তিনি আমাকে টেনে কোলে তুলে বললেন — গা দিয়ে ঘামের গন্ধ বেরুচ্ছে, কি রে ব্যাটা, গায়ে ঘামের গন্ধ কেন? এই বলেই চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করলেন, পরম করুণাময়, এই ছেলের অন্তর থেকে তুমি অন্ধকার দূর কর।

তাঁর প্রার্থনা ঈশ্বর গ্রহণ করেন নি। আমার অন্তরে এমন সব অন্ধকার আছে যা দেখে আমি নিজেও মাঝে মাঝে ভয়ে চমকে উঠি। কাউকে সেই অন্ধকার দেখতে দেই না। আলোকিত অংশটাই দেখতে দেই, কারণ এই আঁধার আমার আপন আঁধার। আমার নিজস্ব অনন্ত অম্বর।

হুমায়ূন আহমেদ
১৩ই নভেম্বর ১৯৯১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই জীবনে বেশির ভাগ কাজই আমি করেছি ঝোঁকের মাথায়। হঠাৎ একটা ইচ্ছে হল, কোনদিকে না তাকিয়ে ইচ্ছাটাকে সম্মান দিলাম। পরে যা হবার হবে। দু'একটা উদাহরণ দেই — আমাদের সময় সায়েন্সের ছেলেদের ইউনিভার্সিটিতে এসে ইংরেজী বা ইকনমিক্স পড়া ছিল ফ্যাশন। আমিও ফ্যাশনমত ইকনমিক্সে ভর্তি হয়ে গেলাম। এক বন্ধু পড়বে কেমিস্ট্রি। তাকে নিয়ে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে এসেছি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। কেমিস্ট্রির একজন স্যার হঠাৎ বারান্দায় এলেন। তাঁকে দেখে আমি মুগ্ধ। কি স্মার্ট, কি সুন্দর চেহারা! তিনি কি মনে করে যেন আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম ইকনমিক্স জলে ভেসে যাক। আমি পড়ব কেমিস্ট্রি। ভর্তি হয়ে গেলাম কেমিস্ট্রিতে। ঐ স্যারের নাম মাহবুবুল হক। কালিনারায়ণ স্কলার। ভৌত রসায়নের ওস্তাদ লোক। যিনি অংক করিয়ে করিয়ে পরবর্তী সময়ে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন।

পি-এইচ ডি করতে গেলাম ভৌত রসায়নে। কোর্স ওয়ার্ক সব শেষ করেছি। দু'বছর কেটে গেছে। একদিন বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট টানছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, তিনশ' দশ নম্বর রুমে বুড়ো এক ভদ্রলোক ক্লাস নিতে ঢুকলেন। রোগা লম্বা একজন মানুষ। গায়ে আলখাল্লার মত কোট। আমার কি যে খেয়াল হল কে জানে। আমিও সেই ক্লাসে ঢুকলাম। সমস্ত কোর্স শেষ করেছি, আর কোর্স নিতে হবে না। কাজেই এখন নিশ্চিন্ত মনে একটা ক্লাসে ঢোকা যায়।

বুড়ো ভদ্রলোকের নাম জেনো উইক্স্। পলিমার রসায়ন বিভাগের প্রধান। আমি তাঁর লেকচার শুনে মুগ্ধ। যেমন পড়ানোর ভঙ্গি তেমনই বিষয়বস্তু। দৈত্যাকৃতি অণুর বিচিত্র জগৎ। ক্লাস শেষে আমি তাঁকে গিয়ে বললাম, আমি আপনার বিভাগে আসতে চাই।

ভৌত রসায়নের প্রফেসর সব শুনে খুব রাগ করলেন। আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন — তুমি যা করতে যাচ্ছ, খুব বড় ধরনের বোকারাও তা করে না। পি-এইচ ডি-র কাজ তোমার অনেক দূর এগিয়েছে। কোর্স ওয়ার্ক শেষ করেছ এবং খুব ভালভাবে করেছ। এখন বিভাগ বদলাতে চাও কেন? মাথা থেকে এসব ঝেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলে দাও।

আমি ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। ঢুকে গেলাম পলিমার রসায়নে। প্রফেসর জেনো উইক্স্ অনেক করলেন। আমাকে ভাল একটা স্কলারশীপ দিলেন। বইপত্র দিয়ে সাহায্য করলেন। কাজ শুরু করলাম পলিমার রসায়নের আর এক জাঁদরেল ব্যক্তি প্রফেসর গ্লাসের সঙ্গে। পলিমারের সব কোর্স যখন নিয়ে শেষ করেছি তখন প্রফেসর গ্লাস আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে বললেন, মাই ডিয়ার সান, দয়া করে এখন শখের বসে অন্য কোন ক্লাসে গিয়ে বসবে না। ডিগ্রী শেষ কর। আরেকটা কথা — আমেরিকান সিটিজেনশীপ পাওয়ার ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

আমি বললাম, আমেরিকান সিটিজেনশীপ দিয়ে আমি কি করব?

'তুমি চাও না?'

'না, আমি চাই না। ডিগ্রী হওয়ামাত্র আমি দেশে ফিরে যাব।'

'বিদেশী ছাত্ররা শুরুতে সবাই এ-রকম বলে। শেষে আর যেতে চায় না।'

'আমি চাই।'

ডিগ্রী শেষ করে দেশে ফিরলাম। সাত বছর আমেরিকায় কাটিয়ে যে সম্পদ নিয়ে ফিরলাম তা হল নগদ পঞ্চাশ ডলার, দুই স্যুটকেস ভর্তি বাচ্চাদের পুরানো খেলনা, এক স্যুটকেস বই এবং প্রচুর চকলেট।

আমি যে সব সময় ইমপাল্স্-এর উপর চলি তা কিন্তু না। কাজে-কর্মে, চিন্তা-ভাবনায় আমি শুধু যে গোছানো তা না, অসম্ভব গোছানো। কখন কি করব, কতক্ষণ করব তা আগে ভাগে ঠিক করা। কঠিন রুটিন। সময় ভাগ করা তারপরেও হঠাৎ হঠাৎ কেন জানি মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। উদ্ভট একে একটা কাণ্ড করে বসি। কোন সুস্থ মাথার মানুষ যা কখনো করবে না।

গুলতেকিনের সঙ্গে বিয়ে হয় এমন ঝোঁকের মাথায়। তখন আমি হতদরিদ্র। লেকচারার হিসেবে ইউনিভার্সিটি থেকে সব মিলিয়ে সাত/আটশ' টাকা পাই। দুই ভাইবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাবর রোডের এক বাসায় থাকি। সে বাসা সরকারী বাসা। এভিকশন নোটিস হয়ে গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট নিজে এসে বলে গেছেন বাড়ি ছেড়ে দিতে। পনেরো দিনের নোটিস। বাড়ি না ছাড়লে পুলিশ দিয়ে উঠিয়ে দেয়া হবে। টাকা পয়সার দিক দিয়ে একেবারে নিঃস্ব। মাসের শেষের দিকে বেশির ভাগ সময়ই বাসে করে ইউনিভার্সিটিতে আসার পয়সাও থাকে না। হেঁটে হেঁটে আমি ক্লাসে যাই। ক্লাস শেষ করে ক্লান্ত হয়ে হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরি। নিতান্ত পাগল না হলে এমন অবস্থায় কেউ বিয়ের চিন্তা করে না। আমি করলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং আমার মনে হল গুলতেকিন নাম্নী এই বালিকাটিকে পাশে না পেলে আমার চলবে না। গুলতেকিনের মা-বাবা আমার কাছে মেয়ে বিয়ে দেবেন না। বড় মেয়েরই বিয়ে হয় নি। ক্লাস টেনে পড়া মেয়ের বিয়ে হবে কি করে? কি করা যায় কিছুই ভেবে পাই না।

একদিন গুলতেকিন ডিপার্টমেন্টে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমি বললাম, চল এক কাজ করি — আমরা কোর্টে বিয়ে করে ফেলি।

সে চোখ বড় বড় করে বলল, কেন? কোর্টে বিয়ে করব কেন?

'খুব মজা হবে। নতুন ধরনের হবে। ব্যাপারটা খুব নাটকীয় না? তোমাকে ভাবার জন্যে তিন মিনিট সময় দিলাম। তুমি ভেবে দেখ, তারপর বল।'

সে ভাবার জন্যে তিন মিনিটের মত দীর্ঘ সময় নিল না। এক মিনিট পরেই বলল, চলুন যাই। কিন্তু আমি তো শাড়ি পরে আসি নি। সালোয়ার-কামিজ পরে কি বিয়ে করা যায়?

কোর্টে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না। কনের বয়স চৌদ্দ। এই বয়সে বিয়ে হয় না। আমি কোন উপায় না দেখে তার ফুপু খালেদা হাবীবকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলাম। আমার সাহিত্যপ্রতিভার পুরোটাই ঢেলে দিলাম চিঠিতে। চিঠি পড়ে তিনি বিস্মিত এবং খুব সম্ভব মুগ্ধ। কারণ তিনি গুলতেকিনের পরিবারের সবাইকে ডেকে দৃঢ় গলায় বললেন, এই ছেলের সঙ্গেই গুলতেকিনের বিয়ে দিতে হবে। অন্য কোথাও নয়। ভবিষ্যৎ-এ যা হবার হবে।

আমার চিঠির জবাবে তিনি আমাকে লিখলেন — "আপনার অদ্ভুত চিঠি পেয়েছি। এত বানান ভুল কেন?"

তাঁরা ক্লাস টেনে পড়া মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন। এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে বিয়ে হবে। এই খবরে আমার এবং আমার মা'র মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। হাতে একটা পয়সা নেই। যে কোন মুহূর্তে আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। এই অবস্থায় বিয়ে! কে জানে নতুন বউ নিয়ে বাসায় এসে দেখা যাবে পুলিশ দিয়ে সবাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। নতুন বউ নিয়ে রাস্তায় রাত কাটাতে হবে।

সংসারের সবরকম দায়-দায়িত্ব থেকে আমার মা আমাকে দূরে সরিয়ে রাখেন। এবারো তাই করলেন। আমাকে ডেকে বললেন, তুই এমন মুখ কালো করে থাকিস না তো। আমি যা করার করব।

মা তাঁর সর্বশেষ সম্বল বাবার দেয়া হাতের একজোড়া বালা, যা তিনি চরম দুঃসময়েও যক্ষের ধনের মত আগলে রেখেছিলেন, বিক্রি করে বিয়ের বাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। জিনিসপত্রগুলি হল খুব সস্তা ধরনের কিন্তু তাতে মিশে গেল আমার বাবা এবং মা'র ভালবাসা। আমি জানতাম ভালবাসার এই কল্যাণময় স্পর্শেই আমার অনিশ্চয়তা, হতাশা কেটে যাবে।

বউ নিয়ে বাসায় ফিরে বড় ধরনের চমক পেলাম। আমার শোবার ঘরটি অসম্ভব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে আমার ছোট বোন। আমাদের কোন ফ্যান ছিল না। কিন্তু আজ মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। বিছানায় কি সুন্দর ভেলভেটের চাদর। খাটের পাশে দুটি সুন্দর বেতের চেয়ার। বেতের চেয়ারের পাশে ছোট্ট একটা টেবিলে একগাদা রক্ত গোলাপ। গোলাপের পাশে একটা চিঠিও পেলাম। মেজো বোন শিখুর লেখা চিঠি —

"দাদা ভাই,

তুমি যে সব গান পছন্দ করতে তার সব ক'টি টেপ করা আছে। কথা বলতে বলতে তোমরা যদি ক্লান্ত হয়ে পড় তাহলে ইচ্ছা করলে গান শুনতে পার। দরজার কাছে একটা ক্যাসেট প্লেয়ার রেখে দিয়েছি।"

ক্যাসেট প্লেয়ার চালু করতেই সুচিত্রা মিত্রের কিন্নর কণ্ঠ ভেসে এল — ভালবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন, তবে কেন মিছে এ ভালবাসা?

গভীর আবেগে আমার চোখে জল এসে গেল। আমি সেই জল গোপন করবার জন্যে জানালা দিয়ে তাকিয়ে বললাম, কেমন লাগছে গুলতেকিন?

সে নিচু গলায় বলল, বুঝতে পারছি না। কেমন যেন স্বপ্ন-স্বপ্ন লাগছে।

'ঘুম পাচ্ছে?'

'না।'

সারারাত আমরা গান শুনে কাটিয়ে দিলাম। দু'জনের কেউই কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। গান শোনা ছাড়া উপায় কি?

পরদিন ভোরবেলা খুব দুঃখজনক ব্যাপার ঘটল। যাদের বাসা থেকে সিলিং ফ্যান ধার করে আনা হয়েছিল তারা ফ্যান খুলে নিয়ে গেল।

গুলতেকিন বিস্মিত হয়ে বলল, ওরা আমাদের ফ্যান খুলে নিচ্ছে কেন?

আমি মাথা নিচু করে রইলাম। জবাব দিতে পারলাম না। বিছানার চমৎকার চাদর, বেতের চেয়ার, ক্যাসেট প্লেয়ার সবই তারা নিয়ে গেল। এমন কি টেবিলে রাখা সুন্দর ফুলদানিও অদৃশ্য। গুলতেকিন হতভম্ব। সে বলল, এসব কি হচ্ছে বলুন তো? ওরা আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে কেন? আমরা বুঝি রাতে গান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনব না?

গুলতেকিনের প্রশ্নের জবাব দেবার মত মানসিক অবস্থা তখন আমার নেই। আমার জন্যে আরো বড় সমস্যা অপেক্ষা করছে। বাসার সামনে পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। আজ আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেবে। এই কারণেই সবাই তড়িঘড়ি করে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।

মা পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে লজ্জায় কাঁপছি। আমার ছোটবোন এসে বলল, দাদাভাই, তুমি ভাবীকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে চলে যাও। এই নোংরা ব্যাপারটা ভাবীর সামনে না হওয়াই ভাল। তাড়াতাড়ি কর। পুলিশ ঘরে ঢুকে পড়ার আগেই কর।

আমি গুলতেকিনকে নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। বৈশাখ মাসের ঘন নীল আকাশ, পেঁজাতূলার স্তূপীকৃত মেঘ, চনমনে রোদ। আমরা রিকশা করে যাচ্ছি। হুড ফেলে দিয়েছি। আমার মনের গোপন ইচ্ছা — পৃথিবীর সবাই দেখুক, এই রূপবতী বালিকাটিকে আমি পাশে পেয়েছি। গভীর আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ। বাসায় এখন কি হচ্ছে তা এখন আমার মাথায় নেই। ভবিষ্যতে কি হবে তা নিয়েও ভাবছি না। বর্তমানটাই সত্যি। অতীত কিছু না — ভবিষ্যৎ তো দূরের ব্যাপার। আমরা বাস করি বর্তমানে — অতীতেও না, ভবিষ্যতেও না।*

শহীদ পরিবার হিসেবে পাওয়া ঐ বাড়ি থেকে পুলিশ আমাদের বের করে দিয়েছিল। আমরা একটি রাত কাটিয়েছিলাম খোলা আকাশের নিচে। খুব মন্দ কাটে নি। আকাশ ছিল তারা ভরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

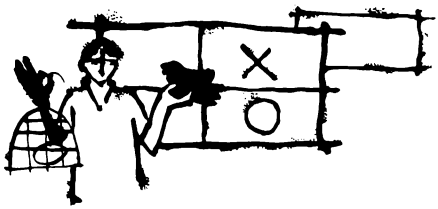

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। উনিশশো' পঁয়ষট্টি সন — একটা স্যুটকেস এবং 'হোল্ডঅল' নামক বস্তুতে লেপ-তোষক ভরে ঢাকা কলেজের সাউথ হোস্টেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। আজ আমাকে সীট দেয়া হবে। একটু ভয় ভয় লাগছে কারণ শুনতে পাচ্ছি যত ভাল রেজাল্টই হোক সবাইকে সীট দেয়া হবে না। যাদের দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে বলে মনে হবে হোস্টেল সুপার তাদের বাতিল করে দেবেন। তাঁর কথাই শেষ কথা। আপীল চলবে না।

আমি দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে নই। কিন্তু চেহারায় সেই ব্যাপারটা আছে কি-না বুঝতে পারছি না। চেহারা দেখে যদি আমাকে দুষ্ট প্রকৃতির মনে হয় তাহলে তো সর্বনাশ! আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি চেহারায় এক ধরনের গোবেচারা ভাব ফুটিয়ে তুলতে।

সুপারের ঘরে ডাক পড়ল। সুপার একবারো আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, ২০৬ নম্বর রুম। জানালার কাছের সীট। কোন ফাজলামী বদমায়েশী করা চলবে না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রোল কল হবে। রোল কলের সময় যদি পরপর দু'দিন সীটে না পাওয়া যায় তাহলে সীট ক্যানসেল। মনে থাকবে?

'জ্বি স্যার, থাকবে।'

'ভাল ভাল ছেলে ঢাকা কলেজে পড়তে আসে। অল্প কিছু ভাল থাকে, বেশির ভাগই বাঁদর হয়ে যায়। কথাটা যেন মনে থাকে।'

'মনে থাকবে স্যার।'

'হোস্টেল ফিস দাও। এক মাসের খাবার বাবদ ৩৮ টাকা। সীট ভাড়া পাঁচ টাকা, অন্যান্য ফী পাঁচ টাকা। মোট আটচল্লিশ।'

আমি আটচল্লিশ টাকা দিয়ে ঢাকা কলেজ সাউথ হোস্টেলে ভর্তি হয়ে গেলাম। আতংকে বুক কাঁপছে। মনে হচ্ছে জেলখানা। এর আগে কখনো বাবা, মা, ভাইবোন ছেড়ে এত দূরে থাকি নি। কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে। কলেজের ছাত্র, কাঁদলে সবাই হাসাহাসি করবে। চোখের পানি আসি-আসি করেও আসছে না।

সেই সময়ে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন জালালুদ্দিন

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কড়া লোক। তাঁর আইন-কানুন বড়ই কঠিন। তৃতীয় দিনেই তাঁর পরিচয় পেলাম। নর্থ হোস্টেলের এক ছাত্র সেকেণ্ড শো সিনেমা দেখে হোস্টেলে ফিরছিল। কপালের ফেরে বেচারা প্রিন্সিপ্যাল স্যারের সামনে পড়ে গেল। স্যার শীতল গলায় বললেন, কাল ভোর দশটার আগেই তুমি হোস্টেল ছেড়ে চলে যাবে। তুমি দুষ্ট গরু। দুষ্ট গরু আমি গোয়ালে রাখব না।

দুষ্ট গরুকে পরদিন সকাল ন'টায় কাঁদতে কাঁদতে রিকশায় বেডিংপত্র তুলে চলে যেতে দেখা গেল। তাকে তখন মোটেই দুষ্ট গরু মনে হচ্ছিল না।

আমরা সবাই সাবধান হয়ে গেলাম। নিঃশ্বাস ফেলতেও সাবধানে ফেলি। প্রিন্সিপ্যাল স্যার যদি আবার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনে ফেলেন। প্রচণ্ড পড়াশোনার চাপ। রাতে রোল কল। মাঝে মাঝে গভীর রাতে চেকিং। ভয়াবহ অবস্থা। এর মধ্যে সপ্তাহটা কোনদিকে যায় বুঝতেই পারি না — সমস্যা হয় ছুটির দিনে। ছুটির দিন আর কাটতে চায় না। ছুটির দিন আইন-কানুন কিছু দুর্বল থাকে। রাত ন'টার সময় প্রিন্সিপ্যাল স্যারের সামনে পড়ে গেলে তিনি শুধু কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করেন — কি নাম? হুজুর বাহাদুরের কি নাম? এই পর্যন্তই। পরদিন সকালে বিছানা-বালিশ নিয়ে চলে যেতে হয় না। ছুটির দিনে হোস্টেলের ছাত্ররা আত্মীয়স্বজনের বাসায় যায়। কেউ কেউ যায় বলাকা সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে। আইয়ুব খানের কল্যাণে তখন ছাত্রদের সিনেমা দেখা খুব সহজ। ছাত্র হলে সরকারী ট্যাক্স দিতে হয় না। টিকিটের দাম অর্ধেক। মুশকিল হচ্ছে ঢাকায় তখন আমার কোন আত্মীয়স্বজন নেই। অর্ধেক দামে সিনেমার টিকিট কেনার মত পয়সাও নেই। সময় কাটানোর জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো শুরু করলাম। সকাল বেলা বেরিয়ে পড়ি। দুপুরের আগে হোস্টেলে ফিরে ভাত খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়ি। ফিরি সন্ধ্যা মেলাবার পর।

এরকম ঘুরতে ঘুরতেই মুখলেসুর রহমান নামের একজনের দেখা পেলাম। তার পেশা অদ্ভুত। ম্যাজিক দেখায়। এবং টাকার বিনিময়ে ম্যাজিকের কৌশল বলে দেয়। ম্যাজিকের যন্ত্রপাতি বিক্রি করে। অপূর্ব সব ম্যাজিক। তাকে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যেই সে দেখাচ্ছে চারটা টেক্কা। নিমিষেই চার টেক্কা হয়ে গেল চার বিবি। এখানেই শেষ নয় — ফুঁ [illegible] চার বিবিও অদৃশ্য। বিবির জায়গায় শাদা তাস। মুখলেসুর রহমান [illegible] রেখে বিড়ি ধরিয়ে বলল, [illegible] যদি এই তাস কিনতে চান [illegible] পাঁচ টাকা। আর যদি শুধু [illegible] তে চান, তিন টাকা [illegible] তিন [illegible]

[illegible] আছে [illegible] অপূর্ব

খেলার কৌশল না জেনে বাড়ি যাওয়া সম্ভব না। আমার কৌতূহল প্রবল, আমার পায়ে শিকড় গজিয়ে গেছে। আমি নড়তে পারছি না। তিন টাকা দিয়ে কৌশল জানলাম। তবে কৌশল বলার আগে আমাকে তিন পীরের, মা-বাবার এবং ভাতের কসম কাটতে হল — এই কৌশল কাউকে বলা যাবে না। মুখলেসুর রহমান যা বলে আমি তাতেই রাজি। আমাকে জানতেই হবে। না জানলে আমি পাগল হয়ে যাব।

কৌশল জানার পর মনটা ভেঙে গেল। এত বড় ফাঁকি! মানুষকে ধোঁকা দেয়ার এত সহজ পদ্ধতি? আমি এমন বোকা! এই সহজ ধোঁকা বুঝতে পারলাম না? আমার তিনটা টাকা চলে গেল? তিন টাকায় ছ'দিন সকালের নাশতা হত। রাগে-দুঃখে আমার চোখে প্রায় পানি এসে গেল। মুখলেসুর রহমান সম্ভবত আমার মনের অবস্থা বুঝল। সে উদাস এবং খানিকটা বিষণ্ন গলায় বলল, তুমি খেলার ফাঁকিটা দেইখা মন খারাপ করলা? ফাঁকির পেছনে বুদ্ধিটা দেখলা না? এই বুদ্ধির দাম হাজার টেকা।

ম্যাজিসিয়ানের দার্শনিক ধরনের কথায়ও আমার মন মানল না। ফাঁকি হচ্ছে ফাঁকি। ফাঁকির পেছনে বুদ্ধি থাকুক আর না থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না। মন খারাপ করে হোস্টেলে চলে এলাম ঠিকই কিন্তু আমার নেশা ধরে গেল। ছুটির দিন হলেই আমি খুঁজে খুঁজে মুখলেসুর রহমানকে বের করি। সে সাধারণত বসে গুলিস্তান এলাকায়। মাঝে মাঝে ফার্মগেটের কাছে। পরের বার তার কাছ থেকে শিখলাম দড়ি কাটার কৌশল। দড়ি কেটে দু'খণ্ড করা হয়। নিমিষের মধ্যে সেই দড়ি জোড়া লাগিয়ে দেয়া হয়। কৌশল এত সহজ কিন্তু করা হয় অতি নিপুণ ভঙ্গিতে। দড়ি কাটার কৌশল শিখতে আমার পাঁচ টাকা চলে গেল। শিখলাম পয়সা তৈরির কৌশল। চার আনা, আট আনার মুদ্রা বাতাস থেকে তৈরি করে ঝনঝন করে টিনের কৌটায় ফেলা হয়। এই কৌশল শিখতে দশ টাকা চলে গেল। তবে এই খেলা কাউকে দেখাতে পারলাম না। এই খেলা দেখানোর জন্যে পামিং জানা দরকার। পামিং হচ্ছে হাতের তালুতে কোন বস্তু লুকিয়ে রাখার কৌশল। আমার পামিং জানা নেই।

হোস্টেলে থাকার জন্য বাসা থেকে সামান্যই টাকা পাই। সেই সামান্য টাকার বড় অংশই চলে যাচ্ছে ম্যাজিকে। আমাকে মিথ্যা করে চিঠি লিখতে হয় — "বই কিনতে হবে, টাকা দরকার। কলমটা হারিয়ে গেছে, নতুন কলম দরকার।"

দু'বছর পর আমি ঢাকা কলেজ থেকে পাস করে বেরুলাম। বন্ধুমহলে আমি তখন ম্যাজিসিয়ান হুমায়ূন বলে পরিচিত। ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যাজিকের ভূত আমাকে ছাড়ল না। আমি তখন সিন্দাবাদ। ম্যাজিকের ভূত আমার ঘাড়ে বসে আছে। যতবার নামাতে যাই ততবারই সে আরো জোরে আমার গলা চেপে ধরে।

পুরানো ঢাকার আওলাদ হোসেন লেনে তখন একজন বৃদ্ধ ওস্তাদের সন্ধান পেয়েছি। বিহারের লোক। পামিং-এর রাজা বলা যায়। হাঁসের প্রকাণ্ড ডিম সে হাতের তালুতে লুকিয়ে ফেলে। তার এক ফুট সামনে বসে থাকা মানুষটিরও বোঝার উপায় নেই যে, সে প্রকাণ্ড একটা ডিম হাতের তালুতে লুকিয়ে রেখেছে। সে শুধু যে হাতের তালুতে ডিম লুকিয়ে রাখছে তাই না, এক হাত থেকে অন্য হাতে সেই ডিম দ্রুত চালান করে দিচ্ছে। চোখের পলকের চেয়েও তার হাতের গতি দ্রুত। তাকে আমি ডাকি ওস্তাদজী। লোকটা মহা ঠগ — আমার কাছ থেকে টাকা নেয় কিন্তু কিছু শেখায় না। বিরসমুখে বলে পামিং শেখানোর কিছু নাই — প্র্যাকটিস কর, প্র্যাকটিস।

সেই প্র্যাকটিস কিভাবে করব তাও বলে দেয় না। অনেক অনুরোধের পর আমার হাতের তালু খানিকক্ষণ টিপেটুপে বলে — তোমার হাত শক্ত। এই হাতে পামিং হবে না। বেহুদা পরিশ্রম। বরং ম্যাজিকের এক গল্প শোন।

ওস্তাদজী এম্নিতে বাংলাতেই কথা বলে তবে গল্পের তোড় এসে গেলে বিহারী কথা শুরু হয়, যার এক বর্ণও আমি বুঝি না। এক সময় ওস্তাদজীর স্ত্রী এসে কড়া ধমক লাগায় এবং আমার দিকে উগ্র চোখে তাকিয়ে বলে, নিকালো — আভি নিকালো। অত্যন্ত অপমানসূচক কথা কিন্তু আমি সেই অপমান গায়ে মাখি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের মাঝামাঝি সময়ে এক প্রতিভা প্রদর্শনীর আয়োজন হল। গান-নাচ-আবৃত্তি যে যা জানে। টিএসসি-তে বিশাল ব্যবস্থা। আমিও উপস্থিত হলাম আমার 'ম্যাজিক প্রতিভা' নিয়ে।

হল ভর্তি ছাত্র-শিক্ষক। বিরাট মঞ্চ। চোখ-ধাঁধানো আলো। ভয়ে আমার পা কাঁপছে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। জিভ সীসার মত ভারী হয়ে গেছে। শুধু তাই না, সাইজেও মনে হয় খানিকটা বড় হয়ে গেছে। মুখ থেকে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে। অনেক কষ্টে প্রথম আইটেম দেখালাম। ট্রায়াঙ্গুলার বাক্স থেকে কবুতর এবং মুরগি বের করার খেলা। এই বাক্স আমার নিজের না — অন্য এক জাদুকরের কাছ থেকে কুড়ি টাকায় ভাড়া করে এনেছি। প্রথম খেলা খুব জমে গেল। প্রচণ্ড হাততালি। আমার আড়ষ্টতা কেটে গেল। দ্বিতীয় আইটেম 'এন্টি গ্রেভিটি বটল'। একটা বোতল মধ্যাকর্ষণ শক্তি উপেক্ষা করে শূন্যে ভাসবে। এটিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমে গেল। আমার মনে হয় ছাত্র-ছাত্রীরা গান শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল — আমার সামান্য ম্যাজিকে যে কারণে তাদের উল্লাসের সীমা রইল না। সেদিন 'খেলা' ভালই দেখিয়েছিলাম। কারণ এক সপ্তাহ না যেতেই টিভি থেকে ডাক পেলাম। তারা একটা প্রোগ্রাম করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে অনুষ্ঠান, যেখানে আমার জন্যে পাঁচ মিনিট বরাদ্দ করা আছে। মিনিটে দশ টাকা হিসেবে আমি পাব পঞ্চাশ টাকা। আমার আনন্দ এবং বিস্ময়ের সীমা রইল না। ঠিক করলাম মুদ্রা তৈরির খেলা দেখাব। শূন্য থেকে মুদ্রা তৈরি করে টিনের কৌটায় ফেলা। ঝনঝন শব্দ হতে থাকবে — এক সময় কৌটা মুদ্রায় ভর্তি হয়ে যাবে।

পুরোটাই হাতের কৌশল। খুবই প্র্যাকটিস দরকার। আমি দরজা বন্ধ করে প্র্যাকটিস করি। নিরলস সাধনা যাকে বলে। এর চেয়ে অনেক কম সাধনায় ঈশ্বর ধরা দেন। মহসিন হলের প্রধান হাউস টিউটর তখন অধ্যাপক এমরান। তিনি একদিন জরুরি চিঠি পাঠিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার বিরুদ্ধে কমপ্লেইন আছে।

'কি কমপ্লেইন স্যার?'

'ঘর বন্ধ করে তুমি না-কি সারারাত কি-সব কর। ঝনঝন শব্দ হয়। কেউ ঘুমুতে পারে না। তুমি কি কর?'

'স্যার, ম্যাজিক শিখি।'

'তুমি কি ম্যাজিক শেখার জন্যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছ? এটা কি ম্যাজিকের স্কুল? খবর্দার, আর যেন ঝনঝনানি না শুনি। আর একবার ঝন-ঝন হলে সীট ক্যানসেল। মনে থাকে যেন।'

আমি বিমর্ষমুখে রুমে ফিরে এলাম। তবে প্র্যাকটিস বন্ধ হল না। কৌটার নিচে তূলা দিয়ে প্র্যাকটিস চালাতে লাগলাম। যথাসময়ে টিভি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। তখন টিভি ছিল ডিআইটি ভবনে। সব প্রগ্রাম হত লাইভ। আমার নিজের অনুষ্ঠান নিজে দেখতে পেলাম না। তাতে আমার আনন্দের কমতি হল না। স্টুডিও থেকে বের হয়ে মনে হল সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছে তরুণ জাদুকরকে।

আমার কোন নেশা দীর্ঘস্থায়ী হয় না — এটা হয়ে গেল। মানুষকে বিস্মিত করতে পারার আলাদা আনন্দ আছে। সেই আনন্দে বুঁদ হয়ে রইলাম। কেমিস্ট্রি পড়া চালিয়ে যাচ্ছি — চালাতে হয় বলেই চালানো। ডিপার্টমেন্টের স্যাররা প্রায়ই [illegible] য়ূন, [illegible]সায় [illegible] জন্মদিনের পার্টি আছে, ম্যাজিক দেখিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাও। আমি মহা উৎসাহে রিকশায় করে বাক্স-টাক্স নিয়ে রওনা হই। একদিন ঢাকা জুট মিলে ম্যাজিক দেখিয়ে দু'শ টাকা পেলাম। একশ' চলে গেল যন্ত্রপাতির ভাড়ায়। একশ' লাভ।

মহসিন হলে যে ঘরে আমি থাকি সেখানে খাঁচায় চারটা কবুতর এবং একটা টিয়া পুষি। ম্যাজিকে কবুতর, টিয়া এসব লাগে। আমার একটাই স্বপ্ন — "ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড অব ম্যাজিসিয়ানস"-এর সদস্য হব। এই সদস্যপদের জন্যে আকাঙ্ক্ষার কারণ হল ঢাকায় দু'জন জার্মান জাদুকর এসেছিলেন। দু'জনই "ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড অব ম্যাজিসিয়ানস"-এর সদস্য। তাঁরা হোটেল শাহবাগে জাদু দেখিয়ে সবাইকে চমৎকৃত করেছেন। আমি নিজে হয়েছি স্তম্ভিত। তখন আর্থিকভাবে খুব অসহায় অবস্থা সত্ত্বেও দু'বার তাদের শো দেখলাম। নেশা লেগে গেল। কঠিন নেশা।

এখন বলি নেশা কি করে কাটল সেই গল্প। নেশা পুরোপুরি কেটে গেল আমার বাসর রাতে। বালিকাবধূকে মুগ্ধ করার জন্য রাত তিনটার দিকে তাকে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করলাম। হয়ত খুব সাবধান ছিলাম না কিংবা নবপরিণীতা স্ত্রীর সামনে নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম — দড়ি কাটার খেলাটা সে ধরে ফেলল এবং খুব হাসতে লাগল। দ্বিতীয় খেলাটায়ও একই অবস্থা।

মেয়েটি তার স্বামীকে চূড়ান্ত রকমের অপদস্ত করল। সে তা বুঝতেও পারল না। আমি তৃতীয় ম্যাজিক দেখাতে যাচ্ছি। সে বলল, রাখুন তো আপনার ম্যাজিক, এইসব কি শুরু করেছেন ? রাত বাজে তিনটা।

ঐ রাতেই আমার শেষ ম্যাজিক শো হল। আর কখনো ম্যাজিক দেখাই নি বা দেখাতে উৎসাহ বোধ করি নি।

বিয়ের দশ বছর পর গুলতেকিন হঠাৎ করে বলতে শুরু করল — বাসর রাতে আমি খুব বোকামি করেছি। আমার উচিত ছিল বিস্মিত হবার ভান করা। সরি, তোমাকে ঐ রাতে খুব লজ্জা দিয়েছি । বয়স কম ছিল। বুঝতে পারি নি যে তুমি এত আগ্রহ করে আমাকে বিস্মিত করার চেষ্টা করছ। এখন একবার ম্যাজিক দেখাও — দেখ, আমি কি পরিমাণ মুগ্ধ হই। ম্যাজিকের কৌশল ধরার চেষ্টা করব না — চেষ্টা করব বিস্মিত হবার।

বিয়ের পর পনেরো বছর হয়েছে। পনেরো বছরে কোন ম্যাজিক দেখাই নি। তার পরেও "কিম আশ্চর্যম!" হঠাৎ ইংল্যাণ্ড থেকে চিঠি এসে উপস্থিত — আমাকে 'ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড অব ম্যাজিসিয়ানস' এর সদস্যপদ দেয়া হয়েছে। এই অতি আশ্চর্য ঘটনা সম্ভব হয়েছে আমার জাদুকর বন্ধু জুয়েল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইচের কারণে। এই ভালমানুষটি আমাকে বিস্মিত করবার সুন্দর ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড অব ম্যাজিসিয়ানের চিঠিটি এসে পৌঁছল আমার জন্মদিনে। কাকতালীয় ব্যাপার তো বটেই। মাঝে মাঝে কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে বলেই আমাদের এই জীবন এবং এই পৃথিবী এত মজার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৬৭ সন। শীতের সকাল। রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যানের ঘরে ভীত মুখে দাঁড়িয়ে আছি। ঘরটা প্রকাণ্ড হলেও অন্ধকার। দিনের বেলাতেও আলো জ্বলছে। সেই আলো অন্ধকারে প্রথম যা চোখে পড়ছে তা হল অপরিচিত একজন মানুষের তৈলচিত্র। মানুষটি রাগী-রাগী চোখে তাকিয়ে আছেন। যেন পৃথিবীর সবার উপরেই তিনি বিরক্ত। ক্যামিকেলস-এর গন্ধে আমার নিঃশ্বাস আটকে আসছে। ঘরে কোন ধোঁয়া নেই, তবু মনে হচ্ছে কাঠ-কয়লা পোড়ানোর ধোঁয়ায় ঘর ভরে আছে।

চেয়ারে ছোটখাট একজন মানুষ বসে আছেন — তিনিই খোন্দকার মোকাররম হোসেন। চোখে ভারী চশমা। তাঁর মুখ হাসি হাসি, তবে সেই হাসি থেকে কেন জানি কোন ভরসা পাওয়া যায় না বরং ভয় লাগে। তিনি নরম গলায় বললেন, তুমি কেমিস্ট্রি পড়তে চাচ্ছ কেন?

আমি উত্তর দিলাম না। কারণ আমার মনে হল না তিনি কোন উত্তর শুনতে চাচ্ছেন। প্রশ্ন করতে হয় বলেই করা। প্রশ্ন করেই তিনি পাশে বসা অন্য একজন শিক্ষকের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলা শুরু করেছেন।

আমার দিকে না তাকালে আমি প্রশ্নের জবাবই বা কেন দেব? আমার একটু ভয় ভয় লাগছে কারণ এখন যা হচ্ছে তার নাম ভর্তির ইন্টারভ্যু। ইন্টারভ্যু ভাল হলে দরখাস্তে সই করে দেবেন। ভর্তি হয়ে যাব। ফট করে কেমিস্ট্রির কোন প্রশ্ন করে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ফর্মূলা একটাও মনে নেই। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হয়ে যাবার পর আর বই খুলে দেখিনি।

আমার খানিকটা একা একাও লাগছে। সবার সঙ্গেই বাবা, খালু বা চাচা এসেছেন। কি পড়লে ভাল হয়, সাবসিডিয়ারী কি নেয়া যায় আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। আমি একা। ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাবা চিঠি লিখে জানিয়েছেন — "পড়াশোনার ব্যাপারটা তোমার। তুমি যা ভাল মনে কর তাই পড়বে। এখানে আমার বলার কিছু থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না।"

খোন্দকার মোকাররম হোসেন স্যার পাশের মানুষটির সঙ্গে কথা বলা শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমিস্ট্রি পড়তে কি তোমার ভাল লাগে? বলেই আগের মত পাশের মানুষটির সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বেশ মজার ব্যাপার তো!

স্যারের কথা বলা শেষ হল। আমার দিকে একবার তাকিয়ে তৃতীয় কোন প্রশ্ন না করেই দরখাস্তে সই করে দিয়ে বললেন, মন দিয়ে পড়বে।

ভর্তির ব্যাপারটা খুব সহজে হয়ে গেল। আমি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। বিরাট এই বিশ্ববিদ্যালয়টা এখন আমার। আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার নিজের জায়গায়। আর কি সুন্দর জায়গা! কার্জন হল — ফুলের বাগানের ভেতর লাল ইটের দালান। প্রাচীন প্রাচীন ভাব। এত ছাত্র-ছাত্রী ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারপরেও যেন সব শান্ত। প্রকাণ্ড দু'টা শিরীষ গাছ কেমিস্ট্রি বিল্ডিংটাকে ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

কার্জন হলের পেছনেই কি বিশাল দু'টা হল। ফজলুল হক হল এবং ঢাকা হল। এই হল দু'টির সামনেও ফুলের বাগান। দুই হলের মাঝখানে সমুদ্রের মত বড় দীঘি। এই হল দু'টির কামরাগুলি আমার পছন্দ হল না। কেমন যেন ছোট ছোট। আলো কম। সেই তুলনায় মহসিন হলকে খুব আকর্ষণীয় মনে হল। নতুন তৈরি হয়েছে। এখনো চালু হয় নি। এ বছরই চালু হবে। ঝকঝক করছে ছ'তলা আকাশছোঁয়া হল। দু'টা লিফট আছে। লিফট আমি আগে কখনো দেখি নি। একবার লিফটে চড়েই মনে হল, এই হলে থাকতে না পারলে মানব জন্ম বৃথা।

মহসিন হলের প্রধান গৃহশিক্ষক তখন পদার্থবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ এমরান। ইনি কারণে এবং অকারণে অতি দ্রুত রেগে যেতে পারেন। ইনার কাছে ইন্টারভ্যু দিতে যাবার আগ মুহূর্তে একজন আমাকে বলল, স্যারের প্রশ্নের উত্তর খুব সাবধানে দিবে। একজন কি উল্টাপাল্টা কথা বলেছিল, স্যার তাকে চড় মেরেছেন।

কি সর্বনাশের কথা! ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসা ছাত্রের গালে কেউ চড় মারতে পারে? ভয়ে এতটুকু হয়ে স্যারের ঘরে ঢুকলাম। স্যার হুংকার দিয়ে উঠলেন, সায়েন্সের ছাত্র তুমি মহসিন হলে থাকবে কেন? সায়েন্সের ছাত্রদের জন্যে ফজলুল হক হল, ঢাকা হল।

'আমি স্যার এই হলেই থাকব।'

'কেন?'

'এদের লিফট আছে স্যার।'

স্যার হেসে ফেললেন। হেসে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হল হাসা ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় নি। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, আমার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করবে না। স্ট্রেইট লাইন চেন? স্ট্রেইট লাইন বানিয়ে ছেড়ে দেব। বিছানা-বালিশ আছে?

'আছে স্যার।'

'বিছানা-বালিশ নিয়ে পাঁচ তলায় চলে যাও। তোমাকে একটা সিঙ্গেল সীটেড রুম দেয়া হল।'

হলে ভর্তি, হলে সীট পাওয়ার ব্যাপারটা এত সহজ? বিশ্বাস হতে চায় না। আমি নিজের ঘরে ঢুকলাম। আগামী চার বছর এটাই আমার ঘর। রুম নাম্বার পাঁচশ চৌষট্টি। একটা কাগজে বড় বড় করে লিখলাম —

হুমায়ূন আহমেদ
রসায়ন প্রথম বর্ষ সম্মান
রোল ৩২

সেই কাগজ ঘরের দরজায় আঠা দিয়ে লাগিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম।

নতুন হলে যাত্রা শুরু হল। প্রথম রাতেই ইমপ্রুভড ডায়েট। রোস্ট, রেজালা, দৈ। খাওয়ার শেষে হলের বাইরের দোকান থেকে জীবনের প্রথম সিগারেটটি কিনে গম্ভীর ভঙ্গিতে টানা শুরু করলাম। ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হয়েছি — অনেক বড় হয়ে গেছি। এখন গম্ভীর ভঙ্গিতে সিগারেট টানা যেতে পারে। মাথা ঘুরছে তাতে কি? বমি বমি আসছে? আসুক না। আনন্দময় জীবনের এই তো শুরু।

হলে ভর্তি হবার পরের সপ্তাহ থেকে ক্লাস শুরু হয়ে গেল। সকাল আটটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত একটানা ক্লাস। সাড়ে বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত লাঞ্চ ব্রেক। দেড়টা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত 'ল্যাব'। ভয়াবহ চাপ। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। সায়েন্স পড়ার একি যন্ত্রণা! আর্টস-এর ছেলেরা দেখি মহাসুখে আছে। একটা দু'টা ক্লাস করে চলে আসে। দুপুরে ঘুমায়। এদের দেখে ঈর্ষায় গা জ্বলে যায়। হায়! কি বোকামি করেছি। কেন আর্টস পড়লাম না?

আমাদের সময় রসায়ন বিভাগের নিয়ম ছিল সবচে' জাঁদরেল শিক্ষকদের দেয়া হত প্রথম বর্ষের ক্লাস। তাঁরা ছাত্রদের ভিত তৈরি করে দিতেন। শক্ত ভিত তৈরি হলে পরবর্তী সময়ে তেমন সমস্যা হত না।

ক্লাসে যেতে হত তৈরি হয়ে। পাঠশালার মত অবস্থা। স্যাররা প্রশ্ন করে করে অস্থির করে ফেলতেন। ক্লাস থেকে ছাত্র বের করে দেয়া ছিল নিত্যদিনকার ঘটনা। কলেজের স্যারদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যারদের একটা বড় ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভেদ প্রথম দিনেই স্পষ্ট হয়ে গেল। কলেজের স্যাররা যখন পড়াতেন তখন মনে হত, যে বিষয়টা তাঁরা পড়াচ্ছেন সে বিষয়টা তাঁরা নিজেরা খুব ভাল জানেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাররা দেখলাম শুধু যে জানেন তা না, এত ভাল করে জানেন যে ছাত্র হিসেবে ভয় ধরে যায়।

ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি পড়াতেন প্রফেসর আলি নওয়াব। তখন অবশ্যি তিনি রিডার (সহযোগী অধ্যাপক)। ক্লাসে ঢুকেই বললেন, বইগুলিতে যা পড়বে সবই বিশ্বাস করবে না। অনেক মিথ্যা কথা লেখা আছে।

আমরা স্তম্ভিত। বই-এ মিথ্যা কথা মানে?

স্যার বললেন, বইগুলিতে অনেক ভুল তথ্য থাকে। আমি সেগুলি তোমাদের দেখিয়ে দেব। তোমরা নিজেরাও ধরতে চেষ্টা করবে। প্রচুর গোঁজামিল আছে। ভুল থিওরী আছে।

আমরা বিস্মিত, বই-এ লেখা থিওরী ভুল! কি আশ্চর্য কথা। স্যার শুধু মুখেই বললেন না — ভুল দেখিয়ে আমাদের চমকে দিলেন।

চার ঘণ্টার ল্যাব। এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। কাজ শেষ করতে হবে। অসংখ্য কাজ। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত ল্যাব ক্লাসে দু'দিন পর-পর ভাইভা। ভাইভা ভাল না হলে স্যাররা স্কলারশীপের বিলে সই করেন না। গার্জিয়ানের কাছে চিঠি চলে যায় — "পড়াশোনা সন্তোষজনক নয়।"

আজ যখন কেউ বলে, আপনার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন কেমন কেটেছে? আমি নস্টালজিক কারণে বলি, খুব চমৎকার! অসাধারণ!

আসলে কিন্তু খুব চমৎকার বা অসাধারণ জীবন তা ছিল না। কেন ছিল না একটু বলি — চব্বিশ বছর আগে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। শিক্ষকরা ছিলেন অন্য গ্রহের মানুষ। তাঁরা অনেকখানি দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। ক্লাস রুমের বাইরে ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল না বললেই হয়। ছাত্রদের কোন সমস্যায় তাঁদের কোন সহানুভূতি ছিল বলেও মনে হয় না। না-হওয়াটাই স্বাভাবিক। যোগাযোগ থাকলে তবেই তো সহানুভূতি তৈরি হবে। যোগাযোগই তো নেই।

একটা ঘটনা বলি — রসায়ন বিভাগের বারান্দায় একটি ছেলে এবং মেয়ে মাথা নিচু করে গল্প করছিল। গল্প করার ভঙ্গিটি হয়ত আন্তরিক ছিল। এবং তারা গল্পও করছিল দীর্ঘ সময়। চেয়ারম্যানের ঘরে দু'জনেরই ডাক পড়ল। চেয়ারম্যান সাহেব তাদের কি বললেন জানি না। মেয়েটি বের হয়ে এল কাঁদতে কাঁদতে। ছেলেটিকে ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যেতে হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ত্রাস আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান এবং অন্যতম সমস্যা। চব্বিশ বছর আগেও কিন্তু সন্ত্রাস একটি বড় সমস্যাই ছিল। এন এস এফ নামে তখন সরকার সমর্থিত একটি ছাত্র দল ছিল। তারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এক ধরনের ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিল। তারা ঘুরতো হকি স্টিক নিয়ে, ছুরি নিয়ে। কারো কারো হাতে থাকতো রিকশার চেইন। রিকশার চেইন না-কি অস্ত্র হিসেবে ভয়াবহ। দু'একজন ভাগ্যবানের কাছে ছিল পিস্তল।

অন্য হলের কথা জানি না। আমাদের মহসিন হলে মাস্তান ছেলেদের জন্যে হলের বাবুর্চি আলাদা করে রান্না করত। তাদের খাবার পৌঁছে যেত তাদের ঘরে। এর জন্যে তাদের আলাদা কোন টাকা-পয়সা দিতে হত না। হলের শিক্ষকরা এইসব ব্যাপার অবশ্যই জানতেন। জেনেও না-জানার ভান করতেন। আমি একটি ভয়াবহ ঘটনার উল্লেখ করে আমার কথার সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করব।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে, পলিটিক্যাল সায়েন্সের আমার পরিচিত এক ছাত্র মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ছুটে এসে বলল, ছ'তলায় এক কাণ্ড হচ্ছে, দেখে আস। গেলাম ছ' তলায়। একেবারে সিঁড়ির গোড়ার ঘরটা বন্ধ। ভেতর থেকে একটি মেয়ের চাপা কান্নার শব্দ আসছে। বাইরে তিন/চারজন কৌতূহলী ছেলে ভীত মুখে দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, কি হয়েছে?

তারা চাপা গলায় বলল, একটা মেয়েকে আটকে রেখেছে।

'তার মানে কি?'

তার মানে যা বলল তাতে আমার মাথা খারাপ হবার অবস্থা। ছ' থেকে সাতজন মাস্তান ঐ ঘরে আছে। নারকীয় কাণ্ড হচ্ছে বিকেল থেকে। মেয়েটা এক সময় চিৎকার করছিল — এখন তাও করছে না। আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, স্যারদের বলা হয়েছে?

'বলা হয়েছে। বলে লাভ নেই — স্যাররাও জানেন কারা এসব করছে।'

আমি ছুটে গেলাম আমাদের ব্লকে যে অ্যাসিস্টেন্ট হাউস টিউটর থাকতেন তাঁর কাছে। তিনি বললেন, তুমি তোমার নিজের কাজে যাও, আমরা দেখছি কি করা যায়।

তাঁরা কিছুই দেখলেন না। এই ঘটনার সাক্ষী আমি নিজে। আজকাল কিছু কিছু শিক্ষক যখন বলেন তাঁদের সময়টা ছিল স্বর্ণযুগ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছিলেন কঠিন। তখন অনেক কষ্টে আমি হাসি চাপি।

আমাদের সময়ই শহীদুল্লাহ হলের (ঢাকা হল) একজন হাউস টিউটরকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপমান করবার জন্যে এক প্রসটিটিউটকে নিয়ে আসা হল। সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে হলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নাম ধরে ঐ শিক্ষককে ডাকতে লাগল।

সরকার সমর্থিত এন এস এফ–এর প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল দেখার মত। কারো হলে সীট হচ্ছে না। এন এস এফ–এর বড় চাঁইকে ধরলেই সীট হয়ে যেত।

ত্রাস সৃষ্টিকারী কিছু চরিত্রের মধ্যে খোকা এবং পাঁচপাত্তুরের নাম মনে পড়ছে। এদের একজন পকেটে জীবন্ত সাপ নিয়ে বেড়াতো বলে শুনেছি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাসের সূচনা ওরাই করে। আমরা এখন সেই ট্র্যাডিশান বহন করে চলেছি — এর বেশি কিছু নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তখনো ছিলেন অসহায়, এখনো অসহায়। তাঁদের মেরুদণ্ড তখনো অশক্ত ছিল। এখনো অশক্ত আছে।

যাক এসব কথা। হল জীবনের কিছু স্মৃতির কথা বলি। হলে–থাকা ছেলেদের মধ্যে একটা বড় অংশই ছিল দরিদ্র। অনেকেই প্রথম এসেছে ঢাকা শহরে। কিছুতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। টাকা–পয়সা যা দেশ থেকে আসছে তাতে প্রয়োজন মিটছে না। প্রাইভেট টিউশানি ব্যাপারটি তখনো চালু হয় নি। এদের বাড়তি রোজগার বলতে কিছু নেই। এই ছেলেগুলি কখনো সকালে নাশতা করে না। বিকেলেও কিছু খায় না। ক্ষিধেয় অস্থির হয়ে এরা অপেক্ষা করে কখন রাত্তের খাবার দেয়া হবে। সন্ধ্যা হতেই এরা ডাইনিং হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, কখন ডাইনিং হল খোলা হবে। এদের নিয়ে হলের অন্য ছাত্ররা নানান ধরনের রসিকতা করে। হাসাহাসি করে। হলের স্মৃতি মনে হলেই আমার এই ছেলেগুলির কথা মনে হয়। হল সম্পর্কে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এই ছেলেদের সব সুখস্মৃতি নিশ্চয়ই ক্ষুধার নিচে চাপা পড়ে গেছে। আমি হলে থাকাকালীন সময়েই এদের একজন ইলেকট্রিক হিটারের তার হাতে জড়িয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। না, কোন প্রেমঘটিত ব্যাপার না — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা চালিয়ে যাবার মত অর্থ জোগাড় করতে পারছে না, আবার বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তেও পারছে না। সে এই কষ্ট থেকে মুক্তি চায়।

সেই সময়কার খবরের কাগজে আমাদের হলেরই একটি ছেলে বিজ্ঞাপন ছাপাল — সে কোন ধনী পিতার কন্যাকে বিবাহ করতে চায়। বিনিময়ে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার খরচ দিতে হবে। সেই ছেলেকে নিয়ে কত হাসাহাসি। কেউ ভেবেও দেখল না কি গভীর বেদনায় সে পয়সা খরচ করে ঐ বিজ্ঞাপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে।

চারতলায় থাকতেন এক মৌলানা সাহেব। তাঁর কথা মনে পড়ে। অতি ভদ্রলোক। দেখা হলেই হাসিমুখে নানান খবর জিজ্ঞেস করবেন। ভদ্রলোক ছিলেন মৌলানায়ে মুহাদ্দেস। সম্ভবত আরবী পড়তেন। তিনি একটা পাখি পুষেছিলেন। খাঁচায় বন্দি সেই পাখির যত্ন ছিল দেখার মত। পাখিটি অতিরিক্ত যত্নের কারণেই বোধহয় — মারা গেল। মৌলানা দীর্ঘ একটি শের (কবিতা) রচনা করলেন। যার প্রথম চরণ —

"মেরা বুলবুল মর গিয়া।"

যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই ধরে ধরে দীর্ঘ কবিতা শুনিয়ে অশ্রুবর্ষণ করেন।

সপ্তাহখানেক পর তাঁর আত্মীয়স্বজনরা খবর পেয়ে তাঁকে দেশের বাড়ি নিয়ে গেল। কারণ পাখির শোকে তিনি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন। এই মৌলানা আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন নি।

*

মহসিন হলের ছ'তলার একটা ঘর ছিল ভূতে-পাওয়া। বাইরে থেকে তালাবন্ধ কিন্তু ভেতর থেকে গুনগুন গানের শব্দ পাওয়া যায়। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় কে যেন স্যান্ডেল পায়ে হাঁটে। রহস্য ভেদ হল দীর্ঘদিন পর। হাউস টিউটররা এক রাতে সেই ঘরে ঢুকে কাবার্ড খুলে রূপবতী এক তরুণীকে আবিষ্কার করলেন। স্যাররা হতভম্ব। জানা গেল মেয়েটি এই রুমের বাসিন্দা স্ট্যাটিসটিকস পড়ে জনৈক ছাত্রের স্ত্রী। দু'জনে গোপনে বিয়ে করেছে। দু'জনের বাবা-মা'ই তাদের বের করে দিয়েছে। বেচারা স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় যাবে! হলে এনে লুকিয়ে রেখেছে কাবার্ডে। এইখানেই এই অসহায় মেয়েটি ছ'মাস ছিল। দেশের এবং দেশের বাইরের কিছু সংবাদপত্রেও ঘটনাটি প্রকাশিত হয়। যেসব মাস্তানরা মেয়ে নিয়ে এসে জঘন্য কীর্তি-কাহিনী করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কিছুই বলে না। কিন্তু অসহায় এই ছেলেটিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছরের জন্যে বহিষ্কার করা হয়।

১৯৬৯ সন। হলের টিভি রুমে আমরা বসে আছি অনেক রাত। রেডিও বাজছে। রানিং কমেন্ট্রি হচ্ছে। অসম্ভব নাটকীয় একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামছে চাঁদে। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছি — সত্যি কি নামতে পারবে? এই তো, এইতো নামল। আমরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম। আনন্দে দু'টা চেয়ার ভাঙা হল। জানালার সব ক'টা কাচ ভাঙা হল। একজন উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে অচেতন হয়ে পড়ে গেল। তাকে বাতাস করা হচ্ছে, মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। কি অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

*

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড লেগেই থাকতো। কবিতা পাঠের আসর, গল্প পাঠ, রবীন্দ্র জন্মোৎসব — কিছু না কিছু আছেই। ছাত্রদের প্রবল উৎসাহ। প্রাণশক্তিতে ছেলেরা যে ঝলমল করছে তা স্পষ্ট বোঝা যেত। ঊনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থানে সেই প্রাণশক্তির পূর্ণ প্রকাশ দেখলাম। জীবনকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কত তুচ্ছ মনে করে তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। গুলি হচ্ছে নীলক্ষেতে — কারফিউ চলছে। সেই কারফিউ অগ্রাহ্য করে মহসিন হলের ছেলেরা ছুটে গেল। গুলিবিদ্ধ দু'টি মানুষকে হলে নিয়ে এল। তখন গভীর রাত। মানুষ দু'টি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আমরা ভীত চোখে দেখছি।

এদের চিকিৎসা প্রয়োজন — কারফিউর ভেতরই ছেলেরা এদের নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। এই স্মৃতি কি করে ভুলি?

আরেকটি কথা না বললে রচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। আমার লেখালেখি জীবনের শুরু হয় মহসিন হলে। ৫৬৪ নম্বর রুমেই রাত জেগে জেগে লিখে ফেলি প্রথম ও দ্বিতীয় উপন্যাস — নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার। যাত্রা শুরু করি অচেনা এক পথে। সেই পথ দুঃখ ও আনন্দময়।

বছর পাঁচেক আগে মহসিন হলে গিয়েছিলাম। রাত দশটার মত বাজে। চুপি চুপি ৫৬৪ নম্বর রুমের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা দিলাম। এক ছেলে দরজা খুলে ভয়ংকর গলায় বলল, কি চাই?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, রং নাম্বার। ভুল জায়গায় এসেছি।

পুরানো তীর্থক্ষেত্র দেখার শখ ছিল। দেখা হল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটি জিনিস দেখার জন্যে আমার তীব্র কৌতূহল ছিল।

মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু। পৃথিবীতে আসা এবং পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার দৃশ্য। জন্মদৃশ্য দেখা তো একেবারেই অসম্ভব। সামাজিক কারণেই পুরুষের পক্ষে জন্মসময়ে উপস্থিত থাকা অকল্পনীয় ব্যাপার।

মৃত্যুসময়ে উপস্থিত থাকাটা সেই তুলনায় অত্যন্ত সহজ। এই সহজ ব্যাপারটি আমার জীবনে ঘটছিল না। আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। চূড়ান্ত অসুস্থ অবস্থায় দেখতে গিয়েছি। কিন্তু মৃত্যুর সময়টিতে কখনো কাউকে দেখিনি।

এক ডাক্তার বন্ধু হাসপাতালে কাজ করে। তাকে আমি আমার গোপন ইচ্ছার কথা বললাম। সে এমনভাবে আমার দিকে তাকালো যেন আমি একজন মানসিক রুগী। রুক্ষ গলায় বললো, মানুষের মৃত্যু দেখার কি আছে? এটা তো কোন নাটক না। তুমি কোন একটা অপারেশন দেখতে চাও, আমি ব্যবস্থা করে দি।

মানুষকে কাটা-ছেঁড়া করার দৃশ্য দেখার ব্যাপারে আমি কোন রকম আগ্রহ বোধ করলাম না। তাকে বলে রাখলাম, হাসপাতালে তো প্রায়ই রুগী মারা যায়। তোমরা ডাক্তার হিসেবে নিশ্চয়ই টের পাও রুগীটি কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবে। এ-রকম দেখলে টেলিফোন করে দিও। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব। আমি শুধু একবারই দেখতে চাই।

ডাক্তার বন্ধু কথা রাখল। আমাকে খবর দিল। আমি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ছুটে গেলাম। বছর চল্লিশের হতদরিদ্র এক রুগী। কনভালশান হচ্ছে — সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট। রুগ্ন এক মহিলা, রুগীটির স্ত্রী হবে — বিছানা ধরে আতংকে ও ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। সাত-আট বছরের দুটি শিশু। একজন অন্যজনকে জড়িয়ে ধরে আছে। ভয়াবহ দৃশ্য। রুগীকে দেখেই মনে হল মৃত্যুই তার জন্যে পরম শান্তি। যত তাড়াতাড়ি তার মৃত্যু ঘটবে তত তাড়াতাড়ি সে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

আমার বন্ধু বলল, আর বেশিক্ষণ নেই — তাকিয়ে দেখ অক্সিজেন দেয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে। অথচ রুগী অক্সিজেন নিতে পারছে না। ফুসফুস ফাংশান করছে না।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার — ডাক্তারদের সব ধারণা ভুল প্রমাণ করে রুগী দেখতে দেখতে স্বাভাবিক হয়ে গেল। খিচুনি বন্ধ হল। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিতে শুরু করল। আমি ডাক্তার নই। তবু স্পষ্ট দেখলাম লোকটির মুখ থেকে মৃত্যুর ছায়া সরে যাচ্ছে। মৃত্যু যেন একটা কুৎসিত নোংরা পশু। পশুটা দাঁত দিয়ে লোকটিকে কামড়ে ধরেছিল — এখন ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়ে সে থাবা গুটিয়ে বসেছে বিছানায়। যে কোন মুহূর্তে বিছানা থেকে লাফিয়ে মানুষটার গায়ে পড়তে পারে। পরাজয় মানতে সে প্রস্তুত নয়। কারণ এখন পর্যন্ত কোন প্রাণী তাকে পরাজিত করে নি। মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে সে পরাজয় মানে, লজ্জিত এবং অপমানিত মুখ করে সরে যায় — আবার আসে।

আমি মহিলার দিকে তাকিয়ে বললাম, ভয় নেই, উনি সেরে উঠছেন। এতক্ষণ মহিলা কাঁদেন নি। এইবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন এবং ভাঙা গলায় বলতে লাগলেন — ডাক্তার সাহেব, আল্লাহ আপনের ভাল করব। আল্লাহপাক আপনের ভাল করব।

ভদ্রমহিলা আমাকে ডাক্তার ভেবেছেন।

মৃত্যুদৃশ্য দেখা হল না। তবে কল্পনাতীত আনন্দের মুখোমুখি হলে মানুষ কেমন করে তা দেখা হল। এই অভিজ্ঞতাও তুলনাহীন।

আমি লক্ষ্য করেছি, কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের চোখের সামনে অসংখ্য মৃত্যু ঘটে। আমার মা এমন একজন মানুষ। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি — মা'কে নিতে দেশের বাড়ি থেকে লোক এসেছে। মা'র কোন–এক আত্মীয়ের অন্তিম সময় উপস্থিত। মা'কে শেষবারের মত না দেখলে তার জীবন বের হচ্ছে না। মা সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন, রুগীকে পানি খাওয়ালেন। জীবন বের হবার প্রক্রিয়া সহজ হল।

আমরা তখন কুমিল্লায় ঠাকুর পাড়াতে থাকি। বাসায় একদিন অপরিচিত এক লোক এসে উপস্থিত। হাতে ছোট্ট টিফিন ক্যারিয়ার। এসেছে ময়মনসিংহের কলমাকান্দা থেকে। লোকটির বাবা না–কি অনেকদিন আগে আমার মা'র হাতে কাঁচা পেঁপের ভাজি খেয়েছিলেন। এখন তিনি মৃত্যুপথযাত্রী, মা'র হাতের কাঁচা পেঁপের ভাজি খেয়ে মরতে চান। বাজার থেকে কাঁচা পেঁপে আনা হল। মা রাঁধতে বসলেন। অফিস থেকে এসে সব শুনে আমার বাবা বললেন, তোমার এই বিখ্যাত ভাজি কলমাকান্দায় পৌঁছতে পৌঁছতে পচে গলে যাবে। নাকি মানুষটার মৃত্যু হবে ফুড পয়জনিং–এ। সেটা কি ঠিক হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বললেন, তাই তো।

সন্ধ্যার ট্রেনে মা ঐ মানুষটার সঙ্গে কলমাকান্দা রওনা হয়ে গেলেন। রুগীর বাড়িতেই পেঁপে ভাজা হবে।

মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের পাশে থাকার আমার তীব্র কৌতূহলের কারণ একটিই — মৃত্যু কিভাবে মানুষকে গ্রাস করে তা দেখা। শেষ মুহূর্তে তার চোখের দৃষ্টি কিভাবে পাল্টে যায়। সেই মুহূর্তে সে কি ভাবে তা জানা সম্ভব নয়। সম্ভবত সে কিছুই ভাবে না। কিছু ভাবার ক্ষমতা তার মস্তিষ্কের থাকে না। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে-আসা একজন মানুষের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। ১৯৭১ সনে দালালীর অভিযোগে তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। একটা কাঁঠাল গাছে তাকে বেঁধে খুব কাছ থেকে পর পর দু'বার গুলি করা হল। কোনবারই গুলি লাগল না। মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার বললেন, এই লোকটার ভাগ্য তো অসম্ভব ভাল। একে ছেড়ে দেন। তাকে ছেড়ে দেয়া হল।

আমি মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে-আসা ভদ্রলোককে বললাম, কাঁঠাল গাছের সঙ্গে যখন বাঁধা হল তখন আপনার চোখ কি খোলা ছিল? চোখ বাঁধা হয় নি?

'জ্বি-না। চোখ বাঁধতে ভুলে গিয়েছিল।'

'তখন কেমন লাগছিল আপনার মনে আছে?'

'জ্বি-না, মনে নাই। তবে কোন রকম লাগতেছিল না। বন্দুকের যে দু'বার গুলির শব্দ হল, একবারও গুলির শব্দ শুনি নাই।'

'গুলির শব্দ শুনেন নি?'

'জ্বি-না। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা — গুলির শব্দ শুনি নাই।'

Near Death experience অর্থাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে-আসা মানুষদের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক বইপত্র লেখা হয়েছে। তার কিছু কিছু আমি পড়েছি। বেশির ভাগ মানুষই বলেন — তাঁরা দেখতে পান অন্ধকারে একটা টানেলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। তীব্র গতিতে যাচ্ছেন, কল্পনাতীত গতিবেগ। টানেলের অন্য প্রান্তে উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধানো আলো। তাঁরা ছুটে যাচ্ছেন আলোর দিকে। এক ধরনের সংগীত শোনা যাচ্ছে। এইসব কি শুধুই গল্পগাথা? উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা? আমি শুনেছি, অনেকেই নাকি মৃত্যুর [illegible] ও আত্মীয়স্বজনদের আশেপাশে দেখতে পান। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন [illegible] কি সত্যি ঘটে? না [illegible] কারণে হারানো [illegible]? জানার কোন উপায় নেই।

প্রায় দশ বছর আগে আমি একটি অসাধারণ বই পড়েছিলাম — [illegible]

world of dyeing children." ক্যানসার হাসপাতালের একদল শিশুর নিজস্ব জগৎ নিয়ে জনৈক নার্সের লেখা দু'শ' পাতার বই। বইটি সে লিখেছিল তার নিজের তাগিদে। পরবর্তী সময়ে এই বইটির জন্যে তাকে মনোবিদ্যায় পি-এইচ ডি ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

বইটিতে লেখা হয়েছে একদল শিশুর কথা, যারা জানে তারা মারা যাচ্ছে। খুব অল্প আয়ু তাদের অবশিষ্ট আছে। এই ভয়াবহ সংবাদটি তারা কি করে আত্মস্থ করে — তাঁরা কি ভাবে তাই নিয়ে লেখা অসাধারণ বই। বইটিতে ন' বছর বয়েসী একটি মেয়ের কথা আছে যে তার বাবা-মা'র সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করত। তাঁরা যখনই তাকে দেখতে আসতেন সে চিৎকার, গালাগালি করত। নার্স একদিন বাচ্চাটিকে তার এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞেস করল, সে বলল — দেখ, আমি যদি খুব ভাল ব্যবহার করি তাহলে আমার মৃত্যুর পর বাবা-মা অনেক বেশি কষ্ট পাবে। সবাইকে বলবে — আমার মেয়েটা কত ভাল ছিল। বলবে আর কাঁদবে। তাই খারাপ ব্যবহার করছি। যাতে আমার মৃত্যুর পর বাবা-মা'র কষ্ট কম হয় । এই বই পড়তে পড়তে আমি ফুঁপিয়ে কেঁদেছি। মৃত্যুর আগের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আরো ভালভাবে জানার ইচ্ছা হয়েছে। ইচ্ছে হলেও সে সুযোগ কোথায়?

আশ্চর্যের ব্যাপার আমার প্রথম ইচ্ছা শিশুর জন্মদৃশ্য দেখা খুব সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ হল। হোটেল গ্রেভার ইন বইটিতে সেই প্রসঙ্গ লিখেছি — আমার দ্বিতীয় কন্যা শীলার জন্মদৃশ্য আমাকে ডাক্তাররাই দেখালেন। আমি স্ত্রী'র হাত ধরে তখন পাশেই ছিলাম। অবাক হয়ে শিশুর জন্ম দেখলাম। ডাক্তাররা তার পা উঁচু করে ধরে আছেন। প্লাসেন্টার সঙ্গে শিশুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এখনো নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া শুরু হয়নি। ডাক্তার শিশুটির পিঠে ছোট্ট করে থাবা দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করল। তার ফুসফুস সচল হল — নতুন একটি জগতে সে প্রবেশ করল। কত-না বিস্ময় তার চোখে!

তাকে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে তার মা'র কোলে শুইয়ে দেয়া হল। কি অবাক কাণ্ড! সে চোখ বড় বড় করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার চোখে পলক পড়ছে না। আমি মনে মনে বললাম, মামণি আমি তোমার বাবা। বিপুল আনন্দের এবং অসাধারণ সৌন্দর্যের এই পৃথিবীতে তুমি এসেছ — আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি — Welcome my little angel.

আমার দ্বিতীয় ইচ্ছাটি পূর্ণ করার ব্যবস্থাও প্রকৃতি করে দিলো। আমার ছেলের মৃত্যু হল আমার চোখের সামনে। মৃত্যুর সময় সেও আমার মেজো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ের মতই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে —। সেই দৃষ্টি সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি ছুটে পালিয়ে এলাম। আবারও ছুটে গেলাম তার পাশে। সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ মেলে আমাকে দেখল। আমি আবার পালিয়ে গেলাম —।

দুটি দৃশ্য দেখার আমার খুব শখ ছিল। পরম করুণাময় ঈশ্বর (?) আমার দুটি ইচ্ছাই পূর্ণ করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

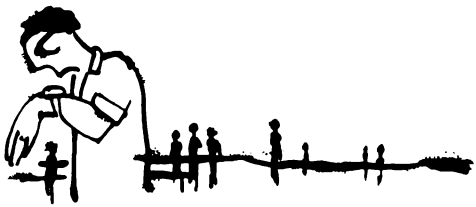

ঘড়ি নামক বস্তুটির প্রতি আমার আশৈশব দুর্বলতা।

কেউ আবার মনে করে বসবেন না আমি 'হাই থটে'র কিছু বলার চেষ্টা করছি — ঘড়ি বহতা সময়ের প্রতীক, মহাকালের প্রহরী ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটেই সে রকম কিছু নয়। আমার দুর্বলতার কারণ ঘড়ি সুন্দর একটা জিনিস। সেকেণ্ডের কাঁটা ক্রমাগত ঘুরছে। তাকিয়ে থাকলে মনে হয় বস্তুটির প্রাণ আছে। কানের কাছে ধরলে হৃদপিণ্ডের শব্দের মত টিকটিক শব্দ হয়।

ক্লাস এইটে প্রথম বৃত্তির টাকা পেয়ে মা'কে বললাম, একটা ঘড়ি কিনে দাও।

মা চমকে উঠে বললেন, এই বয়সে ঘড়ি কি রে? আমি তো আমার জন্মে শুনি নি মেট্রিকের আগে কেউ ঘড়ি পরে। না না, এইসব চিন্তা বাদ দে।

লোয়ার কোর্টে মামলা খারিজ হবার পর হাইকোর্টে আপীল করা হয়। আমিও তাই করলাম। এক সন্ধ্যায় বাবার কানে গোপন ইচ্ছার কথা তুললাম। নিজের বলার সাহস নেই। ছোট বোন শেফু আমার হয়ে বলল।

বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, এই বাচ্চা বয়সে ঘড়ি? বাবুয়ানা শেখা হবে। সব কিছুর একটা সময় আছে। প্রথম দাড়ি-গোঁফ কামাতে হয় মেট্রিক পাসের পর। ঘড়ি কিনতে হয় কলেজে উঠে। আমি প্রথম ঘড়ি কিনি বি.এ. ক্লাসে পড়ার সময়। পাঁচ টাকার কেনা ঘড়ি — এখনো পরছি।

হাইকোর্টেও মামলা খারিজ।

আমার ব্যথিত মুখ দেখে হয়ত বাবা খানিকটা নরম হলেন। উদার গলায় বললেন — মেট্রিক পরীক্ষা আসুক, তখন দেখা যাবে।

শেফু বলল, একটা কিনে দিয়ে দিও বাবা। দাদাভাইয়ের খুব বেশি শখ।

'আচ্ছা আচ্ছা দেব। হাতে ঘড়ি পরেই পরীক্ষা দিতে যাবি।'

দু'বছর পার হল। কয়েকবার মনেও করিয়ে দিলাম। বাবা প্রতিবারই হাসিমুখে বললেন, তাঁর মনে আছে। যথাসময়ে পাওয়া যাবে।

বাবার মধ্যে নাটক করার প্রবণতা আছে। আমি নিশ্চিত, প্রথম পরীক্ষা দিতে যাবার সময় দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ ঘড়ি বের করে

দেবেন। এবং হাসতে হাসতে বলবেন — কি খুশি?

প্রথমদিন বাংলা পরীক্ষা। বাবাকে সালাম করে উঠে দাঁড়ালাম — তিনি বিব্রত গলায় বললেন, বাবা, তুই আমার হাতঘড়িটা নিয়ে যা। কিছু মনে করিস না। টাকা- পয়সার খুব সমস্যা যাচ্ছে, কিনতে পারি নি। কি মন খারাপ না তো?

'না।'

'মন খারাপ না হলে মুখ এমন অন্ধকার কেন? এই সংসারে ঘড়ি কি খুব বড় জিনিস? দেব, আমি কিনে দেব। খুব দামী ঘড়ি কিনে দেব।'

বাবার পাঁচ টাকা দামের ঘড়ি বুক পকেটে নিয়ে পরীক্ষা দিতে রওনা হলাম। হাতে পরার উপায় নেই। বেল্ট বড়, হাতে ঢলঢল করে।

কলেজ জীবনটাও আমার ঘড়ি ছাড়া কাটল। আমার হোস্টেলের খরচ জোগাতেই বাবা তখন হিমশিম খাচ্ছেন। কিছুতেই সামাল দিতে পারছেন না। ঘড়ি আসবে কোত্থেকে!

প্রথম ঘড়ি কিনলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকারও দেড় বছর পর। ইউনিভার্সিটি শীতের বন্ধ হচ্ছে। বন্ধ হবার দু'দিন আগে একসঙ্গে স্কলারশীপের একবছরের টাকা পেয়ে গেলাম। প্রায় হাজারখানিক টাকা! একসঙ্গে এত টাকা? মাথা খারাপ হয়ে যাবার মত অবস্থা। চলে গেলাম ইসলামপুর। সেই সময়কার হিসেবে সবচে' দামী হাত ঘড়িটা কিনলাম। সাড়ে তিনশ' টাকা। খুব সহজ ঘড়ি না। বিশেষ ধরনের জিনিস। একের ভেতর দুই। একটা স্টপ ওয়াচও আছে। স্টপ ওয়াচের উপকারিতা এখনো বুঝতে পারছি না। আপাতত কতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখা যায় সেই পরীক্ষা চলছে। হাতে পরেছি, হাত কেমন ভার ভার লাগে। মনে হয় অন্য মানুষের হাত। দশ মিনিট পরপর সময় দেখতে ইচ্ছে করে। পাশ দিয়ে ঘড়ি-পরা কেউ যাচ্ছে, আমি গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করি, ভাই ক'টা বাজে?

সে হয়ত বলল, দু'টা দশ।

আমি চট করে নিজের ঘড়ি দেখে নেই — হ্যাঁ, আমারটাতেও দু'টা দশ বাজে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘড়ি কেনার আনন্দ অনেকখানি কমে গেল। কেবলি মনে হতে লাগল, খুব-একটা ভুল কাজ করেছি। বাবা যখন দেখবেন আমি নিজের টাকায় ঘড়ি কিনেছি তখন তিনি নিশ্চয়ই মন খারাপ করবেন। অক্ষমতার কষ্ট খানিকটা হলেও পাবেন। তাঁকে সেই কষ্ট দেবার কোন অধিকার আমার নেই। ঘড়ি ফিরিয়ে দেয়া যায়। দোকানি বলে দিয়েছে — পছন্দ না হলে ফেরত নেবে। রিসিট সঙ্গে থাকলেই হল। অল্পবয়সের লোভই জয়ী হল। ফেরত দেয়া হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। আর ফেরত দেবই বা কিভাবে? কি চমৎকার জিনিস! একের ভেতর দুই।

বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি হয়ে গেল। রাত দশটার বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেসে চেপে রওনা হলাম। যাচ্ছি বগুড়া। তখন আমার বাবা-মা থাকতেন বগুড়া।

জানালার পাশে বসেছি। ঘড়ি-পরা হাত বাইরে বের করা — গফর গাঁ রেল স্টেশন থেকে গাড়ি ছেড়েছে। হঠাৎ তীব্র ব্যথায় আমার বাঁ হাত অবশ হয়ে গেল। কোন-এক হৃদয়হীন মানুষ টান দিয়ে ঘড়ি ছিনিয়ে নিয়েছে — হাত কেটে গলগল করে রক্ত পড়ছে। হাতের ব্যথায় নয় প্রবল অভিমানে আমার চোখে পানি এসে গেল। অভিমান ভালবাসার মত, কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমার বেলায় হল। আমি আর ঘড়ি কিনলাম না।

বিয়ের পর হাতে ঘড়ি নেই দেখেই হয়ত আমার শ্বশুর সাহেব তাঁর কন্যার হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে বললেন আমাকে ঘড়ি কিনে দিতে। আমার সংসারে তখন চরম অভাব। মহা সংকট। আমি গুলতেকিনকে বললাম, ঘড়ি জিনিসটা আমার খুবই অপছন্দ।

সে বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

'দেখছ না সব সময় টিকটিক করে মনে করিয়ে দিচ্ছে — সময় ফুরিয়ে গেল। এই জন্যে ঘড়ি দেখলেই আমার গা জ্বালা করে।'

সেই সময় আমি যা বলতাম গুলতেকিন বিশ্বাস করত। তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর সবচে' জ্ঞানী (!!) মানুষটিকে সে বিয়ে করেছে। সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে জ্ঞানী (!!) মানুষটির রুচি এবং অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে। সে বলল, টাকাটা তাহলে কি করব? বাবাকে ফিরিয়ে দেব?

'পাগল হয়েছ? উনাকে ফেরত দিলে উনি অপমানিত বোধ করবেন না? আমার কাছে দাও, আমি খরচ করি।'

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যখন আমেরিকা যাচ্ছি তখনো আমার হাতে ঘড়ি নেই। অবশ্যি ততদিনে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। সময় বোঝা আমার জন্যে কোন সমস্যাই না।

নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পি-এইচ ডি করছি — আমার এক বন্ধু শ্রীলংকার রত্ন সভাপতি সুরিয়াকুমারণ একদিন হতভম্ব হয়ে বলল, আমেরিকার মত জায়গায় তুমি ঘড়ি ছাড়া চলছ, ব্যাপারটা কি?

আমি বললাম, সময় জানা আমার কোন সমস্যা না। তুমি আমাকে সময় জিজ্ঞেস কর, আমি বলে দেব ।

'দশ ডলার বাজি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, দশ ডলার। এখন বাজছে একটা কুড়ি।'

সুরিয়াকুমারণ তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। আসলেই একটা কুড়ি। পাঠকদের কাছে ব্যাপারটা যতটা রহস্যময় মনে হচ্ছে আসল ঘটনা তেমন রহস্যময় নয়। কিছুক্ষণ পরপর অন্যের হাতঘড়িতে সময় দেখে নেয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। সুরিয়াকুমারণের হাতঘড়িতে ক'টা বাজে তা তার সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র এক ফাঁকে দেখে নিয়েছিলাম।

আমার ৩২তম জন্মদিনে আমার স্ত্রী তার বেবী সিটিং-এর টাকায় আমাকে অত্যন্ত দামী একটি সিকো ঘড়ি কিনে দিল। হাসতে হাসতে বলল, এটা 'কোয়ার্টজ ঘড়ি'। টিকটিক করে বলবে না — সময় শেষ। নাও, হাতে পর। এই ঘড়ি আমি অনেক কষ্টের টাকায় কিনেছি।

ঘড়ির উপর থেকে অভিমান উঠিয়ে নিয়ে প্রথম হাতঘড়ি পরলাম। নিজেকে কেন জানি অন্যমানুষ, অন্যমানুষ মনে হতে লাগল। প্রথমবারের মত মনে হল, আর আমাকে অন্যের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না।

আমার এই সিকো ঘড়িটির বয়স এখন দশ। এখনো চমৎকার সময় দিচ্ছে। তবে এই ঘড়ির একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে — যখন আমার স্ত্রী কোন কারণে আমার উপর রাগ করে — ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা একবার না, আমি অসংখ্যবার লক্ষ্য করেছি।

গুলতেকিন রাগ করে। ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়। একদিন দু'দিন কাটে। ঘড়ি হঠাৎ এক সময় আপনা-আপনি চলতে শুরু করে। আমি হাসিমুখে বাড়ি ফিরি। জানি, গুলতেকিনের রাগ পড়ে গেছে। ঘরে ফেরামাত্রই সে বলবে — চা খাবে? চা বানিয়ে এনে দেব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুইস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন একটা ছবি বানাবে — বাংলাদেশের কৃষক পরিবার নিয়ে ছবি। তাদের জীবনচর্যার গল্প।

এই ছবি বানানোর সঙ্গে বেশ ভালমত জড়িয়ে পড়লাম। কাহিনী আমার। পরিচালনা টেলিভিশনের খ্যাতিমান পরিচালক নওয়াজীশ আলি খানের। ক্যামেরার দায়িত্ব নিলেন মিশুক চৌধুরী, শহীদ মুনীর চৌধুরীর ছেলে মিশুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। ছবির ব্যাপারে প্রবল উৎসাহ। মূল চরিত্র ডলি জহুর, আসাদুজ্জামান নূর এবং আবুল খায়ের করবেন। অয়োময়ের লাঠিয়াল মোজাম্মেল হোসেন সাহেবও রইলেন। মোটামুটি শক্ত টিম। তিনজন শিশুশিল্পীও নেয়া হয়েছে। তারা ডলি জহুরের তিন কন্যার ভূমিকায় অভিনয় করবে। এই তিন শিশুশিল্পীও দেখা গেল অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথম শ্রেণীর।

দলবল নিয়ে আমরা চলে গেলাম ময়মনসিংহ। পুরো শ্যুটিং হবে আউটডোরে। জয় বাংলা বাজারে হতদরিদ্র এক কৃষক পরিবারের বসতবাড়ি আমরা দশ দিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে নিলাম। তারা বাড়ি-ঘর, হাঁস-মুরগি ফেলে অন্যত্র চলে গেল। আমরা সেই সবই একটু এদিক-ওদিক করে নিজেদের পছন্দমত সাজিয়ে নিলাম।

বিপুল উৎসাহে কাজ শুরু হল।

রাতের বেলা থাকি একটা ডাকবাংলোয়। ডাকবাংলোটা শহর থেকে দূরে ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে। ভারী সুন্দর। সকালবেলা চলে যাই শ্যুটিং স্পটে। কখনো রাত একটা দু'টোর আগে ফেরা হয় না। এই জাতীয় কাজ বাইরে থেকে দেখতে খুব একঘেঁয়ে এবং বিরক্তিকর মনে হতে পারে কিন্তু যাঁরা কাজটা করেন তাঁদের আগ্রহ এবং আনন্দ থাকে সীমাহীন। একটামাত্র ক্যামেরায় কাজ হচ্ছে। প্রতিটি জিনিস বারবার খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। একটা টেকের জায়গায় দশটা টেক নেয়া হচ্ছে। যেন প্রথম শ্রেণীর ছবি তৈরি হয়। কোন খুঁত যেন না থাকে।

প্রথম দিনের ঘটনা। আমরা সবকিছু এখনো গুছিয়ে উঠতে পারি নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যামেরা এসেছে, লাইট ঢাকা থেকে এখনো পৌঁছে নি। লাইটের জন্য অপেক্ষা। আমরা ডাকবাংলোয় আছি। দুপুরের দিকে স্পটে যাব। সরকারী নাশতা তৈরি হচ্ছে। সময় লাগবে। চায়ের প্রবল তৃষ্ণা বোধ করছি। বাইরের কোন দোকানে চা পাওয়া যায় কি–না সেই খোঁজে বের হয়ে পড়লাম। জায়গাটা শহর থেকে দশ মাইল দূরে। দোকানপাট কিছু নেই। অনেক খুঁজে খুঁজে খুপসি চায়ের দোকান একটা পাওয়া গেল। আমি এত দরিদ্র চায়ের দোকান দেখি নি। তার সম্বল হচ্ছে তিনটি মাত্র চায়ের কাপ এবং কাচের বৈয়ামে ভরা গোটা পাঁচেক টোস্ট বিসকিট। দেখেই মনে হচ্ছে মাস তিনেক আগে কিনে বৈয়ামে ভরা হয়েছে। কাস্টমার জুটে নি। ভবিষ্যতে জুটবে তাও মনে হচ্ছে না। খালি গায়ে একটা ছেঁড়া লুঙ্গি পরে দোকানের মালিক বসে আছে। তার পাশে চার–পাঁচ বছর বয়েসী ফুটফুটে একটা মেয়ে। তারও খালি গা। এই দোকানের আয়ে ওদের সংসার কিছুতেই চলতে পারে না।

আমি বললাম, চা খাওয়াতে পারবেন?

'জ্বী পারব। বসেন। এট্টু দিরং হইব। চুলা নিভা।'

লোকটা একটা টুল এনে দোকানের বাইরে রেখে অতি যত্নে গামছা দিয়ে মুছে দিল। আমি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছি। সবরকম প্রতীক্ষাই কষ্টকর কিন্তু চায়ের প্রতীক্ষায় আনন্দ আছে। আমি দেখলাম বাপ–মেয়ে দু'জনই মহা উৎসাহে চুলায় আগুন ধরাবার চেষ্টা করছে। দু'জনই মনে হচ্ছে আনাড়ি। দু'জনই দু'জনকে ধমকাচ্ছে। প্রচুর ফুঁ, খবরের কাগজে প্রচুর বাতাসের পর আগুন ধরল। কেতলি চাপিয়ে দেয়া হল। আমি শুনলাম, মেয়েটি তার বাবাকে ক্ষীণ স্বরে বলছে, আমারে এক কাপ চা দিবা বাজান?

বাবা মেয়েকে চাপা ধমক দিল, এক কাপ চা এক টেকা। চিনি লাগে, দুধ লাগে। চুপ কইরা বইয়া থাক।

আমি লোকটিকে বললাম, ভাই আমাকে দু'কাপ চা দেবেন।

'জ্বি আইচ্ছা স্যার। আর দেরি নাই, হইয়া আসছে।'

দু'কাপ চা ছোট মেয়েটি আমার কাছে নিয়ে এল। আমি এক কাপ হাতে নিয়ে তাকে বললাম, এই চা তোমার জন্য। নাও, খাও।

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে একবার বাবার দিকে তাকাচ্ছে, একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, বোস এই টুলটায়। এসো, এক সঙ্গে চা খাই।

মেয়েটা আমার পাশে বসল এবং খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে বড়দের মত চা খেতে লাগল। আমি আড়চোখে মেয়ের বাবার দিকে তাকিয়ে দেখি তার চোখে–মুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজ্যের বিস্ময়। মনে হচ্ছে তার দীর্ঘ জীবনে এমন রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে নি। অথচ আমি যা করেছি অন্য যে-কেউ তাই করত। আমি হয়ত একটু বেশি করেছি। চা খাবার জন্য মেয়েটিকে আমার পাশে বসিয়েছি। কিন্তু তার জন্যে এতটা বিস্মিত কেউ হবে ! আমার নিজের খানিকটা অস্বস্তি লাগতে লাগল।

চায়ের দাম দেবার সময় বললাম, আপনার চা ভাল হয়েছে। আমি মাঝে মাঝে আপনার দোকানে এসে চা খেয়ে যাব।

লোকটা বিড়বিড় করে বলল, আপনের যখন মনে চায়, আসবেন। নিশুতি রাইতেও যদি আপনে আমার দোকানের সামনে আইসা মেকু বইল্যা ডাক দেন আমি আপনেরে চা বানায়ে দিমু ।

'কি বলে ডাকতে হবে?'

'মেকু। আমার নাম মেকু। আমি এই দোকানেই মেয়েরে নিয়া ঘুমাই।'

'আচ্ছা, আমার জানা রইল। গভীর রাতে যদি চায়ের পিপাসা পায় আমি আপনার দোকানের সামনে এসে মেকু বলে ডাক দেব।'

দুপুরের দিকে স্পটে চলে গেলাম। প্রথমদিনে রাত দু'টা পর্যন্ত কাজ হল। কাহিনীর বড় অংশই রাতে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লাইটিং দেখতে হচ্ছে। বৃষ্টির রাত আমাদের যেমন দরকার, চাঁদনি রাতও দরকার।

রাত তিনটায় ডাকবাংলোয় ফিরে এলাম। নওয়াজীশ ভাইকে বললাম, চা খাবেন না-কি?

তিনি মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, রাত তিনটার সময় কে আপনাকে চা বানিয়ে দেবে? সব সময় রসিকতা ভাল লাগে না।

'আসুন, খুঁজে দেখি কিছু পাওয়া যায় কি-না। গরমও পড়েছে। খোলা হাওয়ায় হাঁটাহাঁটি করলে ভাল লাগবে।'

উনি বের হলেন। মোজাম্মেল সাহেবও এলেন। আমরা চায়ের সন্ধানে যাচ্ছি শুনে আবুল খায়েরও লাফিয়ে উঠলেন। যে কোন ধরনের অ্যাডভেনচারে এই মানুষটির প্রবল উৎসাহ।

আমি তাঁদের দোকানের সামনে নিয়ে গেলাম। দোকান বন্ধ। ঝাঁপ ফেলা। আমি তিনবার ডাকলাম — মেকু, মেকু, মেকু।

ঝাঁপ খুলে মেকু এবং মেকু-কন্যা বের হয়ে এল। কেউ কোন কথা বলল না। সবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে প্রবল উৎসাহে চুলা ধরাতে শুরু করল। নওয়াজীশ ভাই বললেন, ব্যাপারটা কি বলুন তো?

আমি উদাস গলায় বললাম, ব্যাপার কিছু না। ঐ লোকটার নাম মেকু। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেকুর সঙ্গে এক ধরনের সমঝোতায় চলে এসেছি। যখনি চা খেতে ইচ্ছা হবে, এই দোকানের সামনে এসে তিনবার মেকু বললেই চা চলে আসবে।

আমি ধরেই নিয়েছিলাম ঘটনাটায় সবাই মজা পাবেন। দেখা গেল, যতটা মজা পাবেন বলে আমি ভেবেছিলাম তাঁরা তার চেয়েও দশ গুণ বেশি মজা পেলেন। ডাকবাংলোয় ফিরে শুধু মেকুর গল্প।

মোজাম্মেল সাহেব গল্প বলার ব্যাপারে খুব পারদর্শী। তিনি চোখ বড় বড় করে হাত নেড়ে বলছেন,

"অদ্ভুত কাণ্ড। জনমানব নেই। নিশুতি রাত। একটা বন্ধ ঘরের সামনে হুমায়ূন ভাই গিয়ে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় তিনবার বললেন — মেকু মেকু মেকু" — ওম্নি চিচিং ফাঁক — দোকানের ঝাঁপ খুলে গেল

মেকু রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল। পরদিন ভোরেই আসাদুজ্জামান নূর গেলেন মেকুকে দেখতে। এক কাপ চা খেয়ে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিলেন। মেকু লজ্জিত গলায় বলল, অত বড় নোটের ভাঙতি নাই।

নূর বললেন, ভাঙতি দিতে হবে না। এটা আপনি রেখে দিন। আমি হচ্ছি জমিদার মানুষ — ছোট মির্জা। আপনি বোধহয় আমাকে চেনেন না।

'জ্বে–না।'

'টেলিভিশন দেখলে বুঝতেন যে পঞ্চাশ টাকা ছোট মির্জার হাতের ময়লা। টেলিভিশনে কখনো দেখেন নি?'

'জ্বে–না।'

পরদিন রাতের কথা। আমাদের মেকাপম্যান উত্তম খুব বেজার মুখে আমাকে এসে বলল, স্যার আপনের কথা তো ঠিক না।

'কোন্ কথাটা ঠিক না?'

'আমি ঐ দোকানের কাছে গিয়ে অনেকবার মেকু বলে ডাকছিলাম। কেউ ঝাঁপ খুলল না।'

'চলুন তো ভাই যাই — দেখি কি ব্যাপার।'

আবার আমার সঙ্গে একটা দল জুটে গেল। আমি তিনবার 'মেকু' বলতেই ঝাঁপ খুলে গেল। পিতা–কন্যা ঝাঁপিয়ে পড়ল চুলা ঠিক করতে। বোঝা গেল — মেকু অন্য কারো ডাকে ঘরের ঝাঁপ খুলবে না। ডাকতে হবে আমাকে। এই বিশেষ ব্যবস্থাটা শুধুমাত্র আমার জন্যই। অন্য কারো জন্যে নয়।

ক'দিন মেকু খুব জমজমাট ব্যবসা করল। প্রয়োজনে–অপ্রয়োজনে সবাই চা খেয়ে আসছে। নওয়াজীশ আলি খান মেকুকে একটা লুঙ্গি কিনে দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের যাত্রার সময় হয়ে এল। শেষ চা খেতে গিয়েছি। প্রথমবারের মত এবারো একা একা গেলাম।

মেকু বলল, শুনলাম আইজ রাইত যাইতেছেন গিয়া।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'আপনে যদি মনে কিছু না নেন, আমি আফনেরে এক কাপ চা খাওয়াইতে চাই। এট্টু ইজ্জত করতে চাই।'

'মনে কিছু করব না। ইজ্জত করুন।'

মেকু চা বানাল। গ্লুকোজ বিসকিটের একটা প্যাকেট ছেঁড়া হল। সম্ভবত ইজ্জত করার উদ্দেশ্যেই প্যাকেটটা কেনা হয়েছে। আমি চা খেলাম, বিসকিট খেলাম।

চলে আসবার সময় লক্ষ্য করলাম মেকু বিষণ্ন মুখে চুপচাপ বসে আছে। বাচ্চা মেয়েটি হঠাৎ উঠে এসে পা ছুঁয়ে আমাকে সালাম করে চোখ মুছতে লাগল। এই মেয়েটির সঙ্গে আমার একবারই কথা হয়েছে। আর কখনো কোন কথা হয় নি। আমি বলেছিলাম, বসো আমার পাশে, এসো একসঙ্গে চা খাই। অথচ আজ তার চোখে পানি এসে গেল। কি এমন করেছি আমি? আমি তো মেয়েটার নামও জানি না। একবার ইচ্ছা হল ফিরে গিয়ে নাম জিজ্ঞেস করি। পরমুহূর্তেই মনে হল — কি দরকার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসারত্যাগী মানুষদের প্রতি আমি এক ধরনের মুগ্ধতা বোধ করি। এই মুগ্ধতার কারণ সম্ভবত জীবনানন্দ দাসের কবিতা —

অর্থ নয় কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয়
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়

কোন্ বিপন্ন বিস্ময়ের কারণে এই সব মানুষ সংসার ত্যাগ করে তা জানতে ইচ্ছে করে। অবশ্যি এক অর্থে এরা আবার পলাতক মানুষ। সংসার থেকে পলাতক, জীবন থেকে পলাতক। দায়িত্ব থেকেও পলাতক। পলাতক মানেই পরাজিত। পরাজিত মানুষদের প্রতি মমতা কেন থাকবে?

ভবঘুরে মানুষকে এই সমাজ ভাল চোখে দেখে না। গালাগালি অর্থে আমরা 'ভবঘুরে' শব্দটা ব্যবহার করি। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, সমস্ত ধর্ম প্রচারকরাই ভবঘুরে। জৈনধর্মের প্রচারক মহাবীর, শিখগুরু নানক, গৌতম বুদ্ধ — এঁরা কি জন্ম-ভবঘুরে নন?

'মহাবীর' শুধু যে ভবঘুরে তাই না, সর্বত্যাগী ভবঘুরে। তিনি সমাজ-সংসার সব তো ছেড়েছিলেনই — পরিধেয় বস্ত্রও ছেড়েছিলেন। উলংগ হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

ভবঘুরেদের প্রতিও আমার এক ধরনের মমতা আছে। প্রায়ই মনে হয়, কি সুন্দর তাদের জীবন! পাখির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভবঘুরে বীজ সম্ভবত আমাদের সবার রক্তেই খানিকটা আছে। ঘোর সংসার-আসক্ত মানুষও কোন-এক বিষণ্ন সন্ধ্যায় ক্ষণিকের জন্যে হলেও ভাবে — সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে কোথাও চলে গেলে কেমন হয়? ঐ যে "অন্তর্গত রক্তে বিপন্ন বিস্ময়"।

জননী ছবির কাজে যখন ময়মনসিংহে খুব ব্যস্ততায় সময় কাটাচ্ছি তখন সালেহ ভাই (একজিকিউটিভ ইনজিনীয়ার, পাবলিক হেলথ) খবর আনলেন — রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান, সংসারত্যাগী সাধু মহারাজ সর্বেশ্বরানন্দ আমাদের ফল খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। আমরা গেলে তিনি খুশি হবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারোর তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। সারাদিন শ্যুটিং করে ডাকবাংলোয় ফিরে। সবাই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। কেউ যেতে চান না — শুধু আমি প্রচণ্ডরকম উৎসাহী। সংসারত্যাগী একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলা যাবে। আশ্রম দেখা যাবে।

আমার উৎসাহেই শেষ পর্যন্ত জননী ছবির পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনাব নওয়াজীশ আলি খান উৎসাহী হলেন। অভিনেতা আবুল খায়েরের সর্ববিষয়ে উৎসাহ। তিনিও রওনা হলেন। মোজাম্মেল হোসেন (অয়োময়ের লাঠিয়াল) কোন-এক বিচিত্র কারণে আমাকে কোথাও একা ছাড়তে রাজি নন। আমার ধারণা — পরকালে যদি আমাকে দোজখে পাঠানো হয়, মোজাম্মেল সাহেব করুণ গলায় বলবেন, আমার পাপ-পুণ্যের হিসেবের দরকার নেই। হুমায়ূন ভাই যেখানে যাচ্ছেন দয়া করে আমাকেও সেখানে নিন। তিনিও রওনা হলেন।

মহারাজ সর্বেশ্বরানন্দ গেরুয়া বস্ত্র পরে গেটের কাছে আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রথম দর্শনেই খানিকটা চমকালাম — টকটকে গৌর বর্ণ। কাটা কাটা চেহারা। হরিদ্রা বর্ণের কাপড়ে তাঁকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। সর্বেশ্বরানন্দ হাসিমুখে ভরাট গলায় বললেন, আপনারা এসেছেন। খুব আনন্দ হচ্ছে। সুস্বাগতম।

গেটের ভেতর ঢুকতেই আশ্রমের ছেলেরা উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল। আশ্রমের নিয়ম-কানুন খুব কড়া। এই সময় তাদের পড়াশোনার সময়। উঁকি-ঝুঁকি দেবার সময় নয়। মহারাজ তাদের দিকে ফিরেও নরম গলায় বললেন, এরা আপনাদের জন্যে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। আপনারা কি ভাগ্যবান! যেখানে যান সেখানেই মানুষের মনে আগ্রহ জাগিয়ে তুলেন।

সাধু-সন্ন্যাসীরা কথা বলার বিদ্যায় এত ওস্তাদ হয়, জানতাম না। আমি অবাকই হলাম।

আশ্রম ছোট কিন্তু খুব পরিচ্ছন্ন। ছবি-ছবি ভাব। একটা গাছের শুকনো পাতাও কোথাও পড়ে নেই। মেঝেতে এক বিন্দু ধুলা নেই। মনে হয় হাওয়ায় উড়ে ছোট্ট একটা পাখির পালক পড়লেও কেউ ছুটে এসে তা নিয়ে যাবে।

এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আমার কাছে মেকি মনে হয়। মনে হয়, একদল শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষের কাছে এসে পড়েছি। যারা ধুলা সহ্য করে না, গাছের শুকনো পাতা সহ্য করে না। পাখির পালক সহ্য করে না।

আমরা সাধুজীর অফিসে বসলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ফল খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন — কেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলুন তো?

সাধুজী কিঞ্চিৎ লজ্জিত গলায় বললেন, আশ্রমের ছেলেদের জন্যে একটা টিভি আছে। টিভিতে 'অয়োময়' নাটকটি আমিও ওদের সঙ্গে দেখেছি। আপনারা অয়োময়ের সৃষ্টিকর্তা। আপনাদের দেখতে চাওয়াই কি স্বাভাবিক নয়?

'না, খুব স্বাভাবিক না — আপনি হচ্ছেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এইসব পার্থিব বিষয় আপনার মধ্যে কেন থাকবে?'

কথাগুলি বেশ কঠিন এবং আমি বলেছিও কঠিন ভাবে। ভেবেছিলাম, সাধুজী রেগে যাবেন। তিনি রাগলেন না, হেসে ফেললেন। আশ্রমবাসী এক ছেলেকে বললেন, এঁদের খাবার দাও।

আবুল খায়ের সাহেব বললেন, সাধুজী, আপনার দেশ কোথায়?

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, সেটা তো ভাই বলব না। সন্ন্যাস গ্রহণের পর সন্ন্যাস-পূর্ব জীবনের কথা বলা নিষিদ্ধ।

খাবার চলে এল। নানান ধরনের ফল-মূল। ভাজা মুড়ি। সন্দেশ। বিরাট আয়োজন। প্রতিটি খাবারই অত্যন্ত সুস্বাদু।

সাধুজী বললেন, এই সব খাবার উপহার হিসেবে পাওয়া। ভক্তরা আশ্রমে আসেন। উপহার নিয়ে আসেন। আপনারা তৃপ্তি করে খাচ্ছেন, দেখতে ভাল লাগছে।

আমি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললাম, যদি কিছু মনে না করেন, আমি চা-টা আশ্রমের বাইরে গিয়ে খেতে চাই।

'কেন?'

'সিগারেট ছাড়া আমি চা খেতে পারি না। আশ্রমে নিশ্চয়ই সিগারেট খাওয়ার অনুমতি নেই।'

সাধুজী এই কথার উত্তরে আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন — যে কাজ গোপনে করা যায় সেই কাজ প্রকাশ্যেও করা যায়। আপনি এখানেই সিগারেট খান। কোন বাধা-নিষেধ নেই। একবার আশ্রমের এক অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে কিছু গায়ক-গায়িকা এসেছিলেন। তাঁদের একজন মদ্যপান করতে চাইলেন। আমি ঐ দ্রব্য জোগাড় করে তাঁকে খাইয়েছি।

সিগারেট পানের অনুমতি পাওয়ার পরই সবাই একটা করে সিগারেট ধরিয়ে ঘর অন্ধকার করে ফেললাম। নওয়াজীশ আলি খান, মোজাম্মেল হোসেন দু'জনের কেউই সিগারেট খান না — তারাও দেখি সিগারেট ধরিয়েছেন। সম্ভবত তাঁরা এক ধরনের টেনশান বোধ করছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোজাম্মেল হোসেন সাহেব আশ্রমের কাণ্ডকারখানায় খানিকটা হকচকিয়ে গেছেন বলে মনে হল। তিনি ভাবগদগদ গলায় বললেন — মহারাজ, আমি এক গ্লাস 'জল' খাব।

আমি বললাম, ভাই আপনি সারাজীবন পানি খেয়ে এসেছেন এখন হঠাৎ 'জল' খেতে চাচ্ছেন কেন?

সবাই হা-হা করে হেসে উঠল। আলাপ-আলোচনার প্রাথমিক বাধা এই হাসির তোড়ে কেটে গেল। সাধুজী রামকৃষ্ণের নানান কথা বলতে লাগলেন। সবই খুব উঁচুদরের কথা। দার্শনিক কথা। তিনি যদি তা না করে রামকৃষ্ণের সহজ স্বাভাবিক রসিকতার গল্পগুলি করতেন, ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর অতিসরল উক্তিগুলি করতেন তাহলে সবাই অনেক বেশি উৎসাহিত হত।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের — পরম পুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আমার প্রিয় গ্রন্থের একটি। রামকৃষ্ণের মজার উক্তি, তাঁর হিউমার এবং জটিল বিষয় ব্যাখ্যা করার অসাধারণ ক্ষমতা সব সময়ই আমাকে মুগ্ধ করেছে।

রামকৃষ্ণের আলোচনা যখন উঠল লোভ সামলাতে পারলাম না। আমি কয়েকটা গল্প বললাম।

রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, ঈশ্বর কি?
রামকৃষ্ণ বললেন, বলছি। তার আগে তুই বল, ঘি কি?
ভক্ত বিস্মিত হয়ে বলল, ঘি হচ্ছে ঘি।
রামকৃষ্ণ বললেন, ঈশ্বর হচ্ছে ঈশ্বর।

সাধক ভক্ত রামকৃষ্ণকে বললেন, আমি কুড়ি বছর সাধনা করে মহাবিদ্যা আয়ত্ত করেছি।

'কি সেই মহাবিদ্যা?'

'আমি এখন পায়ে হেঁটে নদী পার হতে পারি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে গাধা, একটা পয়সা দিলেই তো খেয়া নৌকার মাঝি তোকে নদী পার করে দেয়। তোর এই সাধনার মূল্য হল এক পয়সা। আসল সাধনা শুরু কর।'

রামকৃষ্ণ বলছেন — যত মত তত পথ। নদী নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু পড়ে গিয়ে সেই সমুদ্রে। তেমনি ছাদে নানা উপায়ে উঠা যায়। পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, বাঁকা সিঁড়ি, ঘোরানো সিঁড়ি। ইচ্ছে করলে শুধু একটা দড়ি দিয়েও উঠতে পারো। তবে যেভাবেই ওঠো একটা কিছু ধরে উঠতে হবে। সেই একটা কিছু হচ্ছে ধর্ম। যা তুমি ধরবে, তা বাপু একটু শক্ত করে ধরো। পা পিছলে পড়ে না যাও।

এই আশ্রমের একটা জিনিস আমার পছন্দ হল না — মেয়েদের এখানে স্থান নেই। মেয়েরা সাধনার বাধা। এদের সরিয়ে রাখতে হবে দূরে।

আমি সাধুজীকে বললাম, এ-রকম হল কেন? রামকৃষ্ণ নিজে তো বিবাহিত ছিলেন।

তিনি বললেন, আশ্রমের নিয়ম-কানুন স্বামী বিবেকানন্দের করা। তিনি ছিলেন চিরকুমার।

'আপনি নিজে কি মনে করেন মেয়েরা সাধনার বাধা?'

তিনি জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, শেষ প্রশ্ন — আপনার কি এই দীর্ঘ সন্ন্যাস জীবনে একবারও মন কেমন করে নি? একবারও ইচ্ছে হয় নি গৃহবাসী হতে?

সাধুজী এই প্রশ্নের জবাবে বললেন, আপনারা কিন্তু আবার আসবেন। চারটা ডাল ভাত আমার সঙ্গে খাবেন। আশ্রমে অতিথিশালা আছে। এর পরের বার এলে উঠতে হবে আমার অতিথিশালায়। মূল প্রশ্ন আবারো এড়িয়ে গেলেন।

আশ্রমের ছেলেরা দল বেঁধে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দ এবং বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম তাদের অনেকের কাছেই আমার মত গৃহী মানুষের লেখা বই।

ডাকবাংলোয় ফিরে এলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে করতে একটা বেজে গেল। আমি নওয়াজীশ ভাইকে বললাম, আজ একটু নিয়মের ব্যতিক্রম করলে কেমন হয়?

'কি রকম?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। চলুন, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যাই। একটা নৌকা ভাড়া করে ব্রহ্মপুত্র নদীতে ঘুরে বেড়াই।'

আমি ভেবেছিলাম তিনি রেগে যাবেন, রাগলেন না। আমাকে অবাক করে দিয়ে সহজ গলায় বললেন — চলুন।

মোজাম্মেল হোসেন শুয়ে পড়েছিলেন। তিনি গলা পর্যন্ত চাদর টেনে দিয়ে বললেন, খবর্দার আমাকে ডাকবেন না। আমি এইসব পাগলামিতে নেই। এটা একটা কথা হল রাত একটায় ব্রহ্মপুত্র?

আমি নওয়াজীশ ভাইকে নিয়ে গেট পর্যন্ত চলে গিয়েছি। দেখি ভিজতে ভিজতে মোজাম্মেল সাহেব আসছেন। তিক্ত গলায় বলছেন — কোন মানে হয়? এই পাগলামির কোন মানে হয়?

সারারাত আমরা নৌকায় কাটালাম। খোলা নৌকায় চিৎ হয়ে শুয়ে বৃষ্টিতে ভিজলাম। মোজাম্মেল সাহেব একটু পরপর বলতে লাগলেন — অপূর্ব!!

ভোরবেলা মেঘ কেটে আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করল। আমি নওয়াজীশ ভাইকে বললাম, সন্ন্যাসী হয়ে গেলে কেমন হয়?

নওয়াজীশ ভাই বললেন, আমি রাজি। চলুন নৌকা ভাসিয়ে দেই।

আমরা নৌকা ভাসালাম না। তবে সবাই শার্ট খুলে নদীর পানিতে ফেলে দিলাম। নৌকার মাঝি অবাক হয়ে বলল, কি হইছে? — আপনারার কি হইছে? সে বৈঠা দিয়ে তিনটা শার্টের মধ্যে দু'টা শার্ট উদ্ধার করল।

ভোরবেলা ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর নির্মিত চীন মৈত্রী সেতু দিয়ে হেঁটে হেঁটে তিনজন ফিরছি। কারো গায়ে শার্ট নেই। আমাদের ঘোর কেটে গেছে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছি। এখন আমাদের চেষ্টা কত দ্রুত আস্তানায় ফিরে ভদ্র হওয়া যায়।

মর্নিং ওয়াক করতে বের-হওয়া এক ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। একি সমস্যায় পড়া গেল! আমি অন্যদিকে তাকিয়ে হাঁটছি। ভদ্রলোক আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনি কি হুমায়ূন আহমেদ?

আমি মধুর হেসে বললাম, আপনি ভুল করছেন। আমি অন্য ব্যক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব ছোটবেলার কথা মনে করতে গেলেই দেখি দু'একটা বিচ্ছিন্ন চিত্র ছাড়া আর কিছু মনে নেই। এটা বোধহয় সবার জন্যেই সত্যি। সুদূর শৈশবে কিছু গুরুত্বহীন ঘটনা কোন বিশেষ কারণে কাউকে অভিভূত করে। সেটি মনে চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। সেগুলিই মনে থাকে, অন্য কিছু আর মনে থাকে না।

কিন্তু তার মধ্যেও রহস্য আছে। সেই রহস্য বিষয়ে বলবার আগে আমার খুব ছোটবেলার একটা স্মৃতি সম্পর্কে বলি। চোখ বুঁজলেই আমি ছেলেবেলার এই ছবিটি দেখি — একটা ফাঁকা জায়গায় প্রকাণ্ড একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াটি ঘন কৃষ্ণবর্ণ। আমার মামা আমাকে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়াবার চেষ্টা করছেন। আমি ভয়ে মামার গলা ঝাপ্টে ধরে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছি। হঠাৎ ঘোড়াটি বিরক্ত হয়ে প্রবল একটা গা-ঝাঁকুনি দিল। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম অনেকখানি দূরে। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। পরিষ্কার ছবি।

মুশকিল হচ্ছে, এ রকম কোন ঘটনা কি আসলে ঘটেছিল? বাড়ির অন্য কেউ ঘটনাটা মনে করতে পারেন না। এত বড় একটা ব্যাপার কারো মনে থাকবে না? তাছাড়া ঘোড়া আমাদের দেশে এমন কোন সুলভ প্রাণী নয়। তাহলে আমার এই স্মৃতিটি কি মিথ্যা স্মৃতি?

অবশ্যি আমাদের একটা ঘোড়া ছিল। কয়েকদিনের জন্যে প্রকাণ্ড এই প্রাণীটিকে কেনা হয়েছিল। আমার বাবার অনেক ধরনের পাগলামির একটি। সেই ঘোড়ার রঙ লাল। কালো মোটেই নয়। তার চেয়েও বড় কথা — আমার এই স্মৃতি, ঘোড়া কেনারও আগের স্মৃতি।

তবু ধরে নিচ্ছি স্মৃতি প্রতারণা করছে, আগের ঘটনা পরে নিয়ে গেছে। যেহেতু খানিকটা হলেও সন্দেহ আছে। এই ঘটনা বাতিল করে দেয়া যাক।

আরেকটা ঘটনা বলি। নানার বাড়ি গিয়েছি বিয়ে উপলক্ষে। সব ক'টি শিশুকে একটা প্রকাণ্ড বিছানায় শোয়ানো হয়েছে। চার-পাঁচটি লেপ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে আমাদের। প্রচণ্ড শীত। ঘুম আসব আসব করছে — এমন সময় শোনা গেল — আগুন আগুন। পাশের কয়েকটা ঘর পরেই আগুন লেগেছে। চিৎকার

ও ছুটাছুটি। উত্তেজনায় কিছুই খেয়াল নেই। হঠাৎ এক সময় লক্ষ্য করলাম অপরিচিত একটি মেয়ে আমাকে কোলে নিয়ে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির মুখ দেবী প্রতিমার মত। গা ভর্তি গয়না। সে আগুনের দিকে তাকিয়ে খুব হাসছে এবং যতবারই আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকাই ততবারই সে বলে, দেখ দেখ ! আগুন দেখ। এই বলে সে আমার মুখ আগুনের দিকে ফিরিয়ে দেয়। আগুনটা ছিল দেখবার মতই। কিছু সময় পর আগুন আশেপাশের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়লো। লাল হয়ে গেল চারদিক। দূর–দূর থেকে লোকজন ছুটে এলো। এত অল্প সময়ে এত দ্রুত ঘটনাগুলি ঘটলো যে আমার আর কিছুই খেয়াল নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পরবর্তী সময়ে আমি দেখলাম আগুন লাগার ঘটনাটি কারোর মনে নেই। আমার বড় মামা বললেন — "গ্রামের আগুন লাগা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। সবারই মনে থাকতো। এ জাতীয় কোন ঘটনা ঘটে নি। তুমি স্বপ্নে–টপ্নে দেখেছ। তাছাড়া গ্রাম ঘরে এত গয়না পরে কোন মেয়ে থাকে না।" খুবই যুক্তিসংগত কথা। তাহলে আমাকে কোলে নিয়ে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল এবং বারবার আমাকে আগুন দেখাচ্ছিল সে কে? অথচ সেই রূপবতী মেয়ের লম্বাটে মুখ 'পর্যন্ত আমার মনে আছে। ছবি আঁকতে জানলে ছবি আঁকতাম।

শৈশবের স্মৃতির মধ্যে কি তাহলে কোন রহস্য আছে। যে সব ঘটনা স্মৃতি বলে ভেবে রাখি তার সবগুলি এ–জীবনে আদৌ ঘটে নি। তা কেমন করে হয়? শৈশবের স্মৃতি কি তাহলে দু'রকমের? সত্যি স্মৃতি ও মিথ্যা স্মৃতি?

এই নিয়ে আমি প্রথম গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করি যখন আমার বয়স তেত্রিশ। সন–তারিখ মনে নেই, আমি তখন আমেরিকাতে। ল্যাবরেটরিতে কাজ করছি, টমাস বাইহোফার নামের একজন গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট এসে বললো — যাও বাইরে গিয়ে দেখো, তুষার ঝড় শুরু হয়েছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি চারদিক বরফে ঢেকে গেছে। শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। তুষার পড়ছে সমানে। দু'হাত দূরের মানুষটিকে পর্যন্ত দেখা যায় না। এই প্রথম তুষারপাত দেখা। অদ্ভুত অনুভূতি। কিন্তু আমার চট করে মনে হলো অবিকল এই দৃশ্য আমি দেখেছি সিলেটের মীরা বাজারে। একদিন দুপুরবেলা আকাশে খুব মেঘ করেছে। আমরা যাতে বাইরে যেতে না পারি সে জন্যে দরজার হুড়কো লাগিয়ে মা পাটি বিছিয়ে ঘুমাচ্ছেন। এমন সময় বৃষ্টি শুরু হলো। আমি বৃষ্টি দেখবার জন্যে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি চারদিক শাদা হয়ে গেছে। এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। সেই শৈশবেই বুঝতে পারলাম এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার এবং [illegible] [illegible] [illegible] দেখানো উচিত। কিন্তু আমার কাউকে ডাকতে ইচ্ছা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো না। আমি একাই অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখলাম।

এর মানে তাহলে কি দাঁড়ায় বা আদৌ কোন মানে দাঁড় করানো যায় কি? এগুলি কি শৈশবের ফ্যান্টাসি? শিশু বয়সে কল্পনায় এ-রকম একটি দৃশ্য তৈরি করেছি যা মিলে গেছে বাস্তবের সঙ্গে বা কাছাকাছি একটা মিল পাওয়া গেছে?

"আছাদ" নামের আমাদের একজন কাজের লোক ছিল। সে সব সময় বলত খুব ছোট বয়সে সে একবার "পরী" দেখে। পরীর বর্ণনাটা বইয়ের পরীর আঁকা ছবির সঙ্গে মিলে না। পরীটার গায়ে নাকি কচি ঘাসের মত একটা বাজে গন্ধ ছিল। পায়ের নখগুলি ছিল পাখির নখের মত অস্বাভাবিক লম্বা এবং গায়ের রং ধবধবে শাদা নয় — ছাই বর্ণের। অসংখ্যবার সে এই পরীর গল্প আমাদের করেছে। তখন আমি বেশ বড় এবং বুঝতে শিখেছি যে রূপকথার পরীকে বাস্তবে দেখার কোনই সম্ভাবনা নেই। কাজেই আছাদ যতবারই এ-গল্প বলে ততবারই আমি তাকে ঠাট্টা করি এবং সে কেঁদে-কেটে এক কাণ্ড করে। যেন এ-গল্প বিশ্বাস করতেই হবে।

বছর সাতেক আগে আছাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। এখন রীতিমত একজন বুড়ো মানুষ। আমি সেই পরীটির কথা জিজ্ঞেস করতেই সে ঠিক আগের মত উৎসাহ নিয়ে বলতে শুরু করলো। ঘাসের গন্ধের কথা বললো কিন্তু পরীটিকে কোথায় দেখেছে, দিনে দেখেছে না রাতে দেখেছে সে সব কিছুই বলতে পারলো না। তার নাকি মনে নেই। শুধু মনে আছে পাখির নখের মত লম্বা নখ। ছাই বর্ণের গা।

আমি খুব অস্বস্তি নিয়ে বললাম, গায়ে কাপড় ছিল না নগ্ন ছিল? আছাদ জবাব দিল না মাথা নিচু করে রইল। জবাবটা এই থেকে আঁচ করা যায়।

আমি অনেককেই জিজ্ঞেস করেছি খুব ছেলেবেলার কোন অদ্ভুত স্মৃতি তাদের আছে কি-না। কেউ তেমন অদ্ভুত কিছু আমাকে বলে নি। আমার মেজো মেয়ে শীলার বয়স তিন। তাকে আমি বলেছি, মজার মজার কোন জিনিস যদি কখনো দেখ, আমাকে বলবে। সে এটাকে খেলা মনে করে রোজ আমাকে তিন-চারটি গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলে। এগুলি বানানো গল্প। তা দু'একটা উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে।

"বাবা, আজকে আমি দেখলাম, জানালা দিয়ে একটা কাক এসে তোমার সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে কপ করে খেয়ে ফেলেছে।"

"বাবা, আজ দেখলাম, একটা ছাগল মটর গাড়ি চালাচ্ছে।"

আমার এক্সপেরিমেন্ট সফল হয় নি। শৈশবের স্মৃতির একটা বড় অংশ মিথ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতি — এটা প্রমাণ করার মত যুক্তি আমার হাতে নেই। না-থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে, কেউ মনে করেন না তাঁদের স্মৃতির মধ্যে ভেজাল আছে। সারা জীবন সমস্ত স্মৃতিকে সত্যই ভাবেন। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কোন স্মৃতি যদি থাকে তবে তার তিনি একটি স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেন। সহজভাবেই বলেন — "আরে দূর, ছোটবেলায় কি দেখতে কি দেখেছি। কিছু মনে আছে নাকি?"

কিন্তু আমি কোন অস্পষ্ট স্মৃতির কথা বলছি না। আমি বলছি এমন সব স্মৃতির কথা যেগুলি স্বর্ণখণ্ডের মত চক্‌চক্‌ ঝক্‌ঝক্‌ করছে। যেমন আমার দেখা আগুন লাগার দৃশ্যটির কথা। যার প্রতিটি ছবি এখনো পরিষ্কার দেখতে পাই, যে মেয়েটি আমাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল আগুনের আঁচে কিংবা ঘটনার উত্তেজনায় তার কপালে যে ঘাম জমেছিল সেগুলি পর্যন্ত আমার চোখে ভাসে।

এটা স্বপ্নদৃশ্য নয় — স্বপ্ন হয় অস্পষ্ট। যেখানে কোন চিত্রই পরিষ্কার ভাবে আসে না। স্বপ্নে একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার কোন মিল থাকে না। সমগ্র স্বপ্নে একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব থাকে। আমার দেখা ঐ আগুন লাগার দৃশ্যে বা ঘোড়ার দৃশ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। ছাড়া-ছাড়া ভাব নেই।

তুষারপাতের দৃশ্যটির কথা আমি না হয় বাদ দিচ্ছি। ধরে নিচ্ছি, ঐদিন এত বেশি বৃষ্টি হচ্ছিল কিংবা শিল পড়ছিল যাতে সব শাদা হয়ে গেছে। কিন্তু আগুন লাগার দৃশ্যটি বা ঘোড়ার দৃশ্যটির ব্যাখ্যা কি?

বড় রহস্যময় একটি জগতে আমরা বাস করি। আমাদের চারপাশে বিপুল অন্ধকার। বড় ইচ্ছা করে এই গাঢ় অন্ধকার অন্তত একবারের জন্য হলেও কাটুক। একবার অন্তত বিপুল রহস্যের একটা অংশকে স্পর্শ করি।

কোনদিন কি তা সম্ভব হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় — আপনি কি আস্তিক? আল্লাহ্ বিশ্বাস করেন? এই সব ক্ষেত্রে হ্যাঁ বলা বিপদ, আবার না বলাও বিপদ। প্রশ্নকর্তা যদি নাস্তিক হন — আমি হ্যাঁ বললে অসংখ্য যুক্তিতর্ক ফাঁদবেন এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন যে, ঈশ্বর বলে কিছু নেই। একটাই আমাদের জীবন। এইসব যুক্তি সবই আগে শোনা । নতুন কথা কেউ বলতে পারেন না। পুরানো জিনিস বারবার শুনতে ভাল লাগার কথা না। আমার কখনো ভাল লাগে না। ভাল না লাগলেও এই প্রশ্ন আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়।

উত্তরে আমি সাধারণত বলি, আপনার কি মনে হয়? এই বলে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করি। আলোচনা নিয়ে আসতে চেষ্টা করি ভূত–প্রেতের দিকে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের চেয়ে ভূত–প্রেতের অস্তিত্বের আলোচনা সহজ।

তবে সমস্যা আছে। ভূত–প্রেত নিয়ে আলোচনা শুরু হলে অসংখ্য ভূতের গল্প শুনতে হয়। যিনি ভূতে বিশ্বাস করেন না তাঁর স্টকেও গোটা দশেক ভূতের গল্প জমা থাকে। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন গল্প শোনাতে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সব ভূতের গল্পের ফর্মূলা এক। 'অশরীরী আত্মা এসে কিছু বলবে।' ঠিকমত বলতে না পারলে এই জাতীয় গল্পগুলি অত্যন্ত হাস্যকর শোনায়। অধিকাংশ সময়ই গল্পকথক তা জানেন না।

মূল ব্যাপার হচ্ছে পরিবেশ সৃষ্টি। পরিবেশ সৃষ্টি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। হাসির গল্প বলার জন্যে পরিবেশ তৈরি করার কোন প্রয়োজন নেই — গল্পটা বলে ফেললেই হল। দুপুর রোদে হাটের মাঝখানে ভূতের গল্প বলা যায় না। বর্ষার রাত, হারিকেনের আলো, অসম্ভব মনোযোগী কিছু শ্রোতা ছাড়া ভূতের গল্প হয় না।

একবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে রিকশা করে নিউ মার্কেট যাচ্ছি। ভরদুপুর — ঝাঁ–ঝাঁ করছে রোদ। বন্ধু হঠাৎ কি মনে করে ভূতের গল্প শুরু করলেন। তাঁর বাড়ির ঘটনা। আমার ইচ্ছা করছিল কোন–একটা ট্রাক এলে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ট্রাকের নিচে ফেলে দিতে। এতটা নির্বোধ মানুষ কি করে হয়? সে গল্পটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছেও খুব হেলাফেলা ভাবে — তখন মনে হল, আরে, এই লোক তো আসলে ভূতের গল্প বলবে বলে বলছে না। আমাকে ভয় পাওয়ানো তার উদ্দেশ্য নয়। সে তার বাড়ির একটি ঘটনা বর্ণনা করছে। আমি আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগলাম — গল্প শেষ হলে আতংকে দম বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা হল। এখান থেকে একটা জিনিস শিখলাম — ভূতের গল্পের জন্যে পরিবেশ কোন অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার নয়। মূল বিষয় হচ্ছে, বিশ্বাসযোগ্যভাবে গল্পটি বলা। শ্রোতার মনে ধারণা তৈরি করে দেয়া যে গল্পটা সত্যি।

ভূতের গল্পের প্রতি আমার দুর্বলতা সীমাহীন। রহস্যময়তার জন্যেই এই গল্পগুলি আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। খুব ছোটবেলায় মনোজ বসুর একটা গল্প পড়েছিলাম — লাল চুল। একটি মেয়ের বিয়ে হবে। বর আসবে সন্ধ্যায়। যেহেতু তাকে রাত জাগতে হবে তাকে অবেলায় শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হল। যাতে সে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে সেজন্যে ঘর খালি। মেয়েটি একা একা ঘুমুচ্ছে।

সন্ধ্যা বেলা বর এল। "বর এসেছে, বর এসেছে" খুব হৈ চৈ হচ্ছে। মেয়েটির ঘুম ভেঙে গেল। সে একা একা উঠে গেল ছাদে। ছাদ থেকে ঝুঁকে সে বর দেখার চেষ্টা করছে — হঠাৎ পা পিছলে গেল। দু'তলা থেকে পাকা বারান্দায় মেয়েটি পড়েছে, মাথা ফেটে গেছে, গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে, তার কালো চুল হয়ে গেল টকটকে লাল।

গল্পের শুরু এখান থেকে — মেয়েটির মৃত্যুর পর। কি অভিভূত যে হয়েছিলাম গল্প পড়ে! গল্প শেষ করবার পর মনে হচ্ছিল মেয়েটি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর রেশমী শাড়ির খসখস শব্দ কানে আসছে, গা থেকে চাপা ফুলের ঘ্রাণ আসছে।

আমার জীবনের প্রথম লেখা গল্পটিও ছিল ভৌতিক গল্প। স্কুল ম্যাগাজিনের জন্যে লেখা — ভয়ংকর ভৌতিক কাণ্ডকারখানা আছে। অবশ্যি শেষের দিকে দেখা গেল পুরো ব্যাপারটাই ঘটছে স্বপ্নে।

সচেতনভাবে ভূতের গল্প লিখি '৮৭ সনের দিকে। নাম 'দেবী'। দেবী লেখার ইতিহাসটাও বেশ মজার — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর জাফর মাহমুদের বাসায় এক সন্ধ্যায় গিয়েছি। স্যার বললেন, হুমায়ূন, আমার এক আত্মীয়া তোমাকে দেখতে চায়। ও বোধহয় কিছু বলবে। তোমার বই–টই পড়েছে।

আমি বললাম, নিয়ে আসুন স্যার।

স্যার ১৮/১৯ বছরের এক তরুণীকে নিয়ে ঢুকলেন। মেয়েটা রোগা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিরিক্ত রকমের ফর্সা। তাকে রূপবতী বলা যায়, তবে চোখে এক ধরনে অস্বাভাবিকতা আছে। এই দৃষ্টি মানুষকে কাছে টানে না, দূরে সরিয়ে দেয়।

আমি হাসিমুখে বললাম, তুমি আমাকে কিছু বলবে?

সে কঠিন চোখে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে চলে গেল।

আমি অপ্রস্তুত। জাফর স্যারও অপ্রস্তুত। আমি বললাম, স্যার মেয়েটির বোধহয় লেখক পছন্দ হয় নি। সে হয়তো আরো ভারিক্কি কাউকে আশা করেছিল।

স্যার বললেন, ব্যাপার তা না। ওর কিছু সমস্যা আছে। দাঁড়াও, তোমাকে বলি — মেয়েটার বাড়ি পদ্মা নদীর তীরে। বাড়িতে টিউবওয়েল আছে, তবু বেশির ভাগ সময় নদীতেই এরা গোসল করে। মেয়েটির বয়স তখন বারো কিংবা তেরো। নদীতে গোসল করছে হঠাৎ তার কাছে মনে হল কে যেন তার দু'পা জড়িয়ে ধরেছে। সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। পা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। পারল না। যতই ছাড়াতে চেষ্টা করে ততই জোরে দু'টা মানুষের হাতের মত হাত তাকে চেপে ধরে। মেয়েটির চিৎকারে অনেকেই ছুটে এল। তাকে টেনে পারে তোলা হল। দেখা গেল একটি মৃতদেহ মেয়েটির পা জড়িয়ে ধরে আছে। মৃতদেহটির মাথা নেই। ভয়াবহ ঘটনা। মেয়েটির মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন তার চিকিৎসা চলে। ঢাকায় সে চিকিৎসার জন্যে এসেছে। এখন সে অনেক ভাল। আমরা মেয়েটির বিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।

আমি গভীর আগ্রহে বললাম, স্যার, আমি মেয়েটাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি কি তাকে একটু ডাকবেন?

স্যার উঠে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, ও আসবে না। অনেক বুঝালাম।

'দেবী' উপন্যাসে আমি এই মেয়েটির গল্পই বলেছি।

ভূত-প্রেত বিষয়ক অনেক লেখা লিখলেও আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ভূত দেখি নি। আমার কোন রকম ভৌতিক অভিজ্ঞতাও নেই। বেশ কয়েকবার তীব্র ভয় পেয়েছি। এর বেশি কিছু না। ভয় পাওয়া এক ব্যাপার — ভূত দেখা অন্য ব্যাপার।

একটা ভয় পাওয়ার গল্প বলি — রাতে ঘুম আসছে না। আমি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছি। শহীদুল্লাহ হলের যে-বাসায় আমি থাকি তার বারান্দাটা দেখার মত। তিনশ' ফুটের মত লম্বা। আমি বারান্দার এক মাথা থেকে অন্য মাথায় যাচ্ছি, আবার ফিরে আসছি। বারান্দার সব বাতি নেভানো। তবু বেশ আলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। বাসার সবাই ঘুমে অচেতন। আমার মেজো মেয়ের ঘুমের মধ্যে খিলখিল করে হাসার রোগ আছে। একবার সে হেসে আবার চুপ করে গেল।

বারান্দায় বুক শেলফের কাছে একটা বেতের চেয়ার আছে। বেশ খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আমি ক্লান্ত হয়ে চেয়ারটায় বসলাম। বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আতংকে অস্থির হয়ে পড়লাম। এই আতংকের ধরন আলাদা। এর জন্ম আমাদের চেনা-জানা পৃথিবীতে নয়। অন্য কোথাও। আমার মনে হল আমার চেয়ারের ঠিক পেছনে কেউ-একজন দাঁড়িয়ে আছে যে তার বরফশীতল হাত এক্ষুনি আমার দু'চোখের উপর রাখবে।

চিৎকার করে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার চিৎকার এতই ভয়াবহ ছিল যে আমার স্ত্রীর ঘুম ভাঙল। আমার কন্যাদের ঘুম ভাঙল।

এই ভয়াবহ ঘটনার আমি নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি। ব্যাখ্যাটা বলি — অনিদ্রায় ক্লান্ত হয়ে আমি চেয়ারে বসামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমুবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

এই ব্যাখ্যা যে কোন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার কথা, আমার কাছে নয় — কারণ অনিদ্রা রোগ আমার দীর্ঘদিনের সাথী। ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ার মত অবস্থা কখনো আমার হয় না। সেদিনও হয় নি।

তাহলে এমন ভয়ংকর ভয় কেন পেলাম? এই ভয় কি আমার অবচেতন মনের কোন অন্ধ গুহায় লুকিয়ে ছিল? শুনেছি, কোন মানুষ পাগল হবার আগে অকারণেই প্রচণ্ড ভয় পায়। তীব্র ভয়ে অভিভূত হবার পরপরই পাগলামি শুরু হয়। সে চলে যায় ভয় এবং আনন্দের ঊর্ধ্বে।

আমি আমার পরিচিত মানুষদের প্রায়ই জিজ্ঞেস করি — আচ্ছা, আপনি কি কখনো অকারণে তীব্র ভয় পেয়েছেন? আমার এই সহজ প্রশ্ন কেউই বুঝতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে বলেন — হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছি। অবশ্যই পেয়েছি — একদিন কি হয়েছে শুনুন। রিকশা করে যাচ্ছি হঠাৎ একটা প্রাইভেট কার এসে ধাক্কা দিয়ে রিকশাটা ফেলে দিল। আমি ছিঁটকে পড়লাম রাস্তার মাঝখানে — তাকিয়ে দেখি দানবের মত একটা ট্রাক ছুটে আসছে — ভয়ে আতংকে

আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, এই ভয় তো অকারণ ভয় নয়। ভয় পাওয়ার আপনার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। আমি জানতে চাচ্ছি, ভয় পাওয়ার মত কিছুই ঘটে নি অথচ আপনি ভয়ে দিশাহারা হয়ে গেলেন।

'কি সব পাগলের মত কথা যে আপনি বলেন — ভয় পাওয়ার মত কিছু না ঘটলে আমি শুধু শুধু ভয় পাব কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিবার্য নিয়তির সামনে দাঁড়ালে তীব্র ভয় এক সময় এক ধরনের প্রশান্তিতে পরিণত হয় বলে আমার ধারণা। ১৯৭১ সনে পাক মিলিটারী আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল। তীব্র ভয়ে আমি অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পরপর আমার সব ভয় দূর হয়ে যায়। এক ধরনের প্রশান্তি বোধ করতে থাকি। প্রচণ্ড জ্বরে কাতর থাকার পর হঠাৎ জ্বর সেরে গেলে যেমন ক্লান্ত অথচ শান্তি শান্তি ভাব হয় অনেকটা সে-রকম।

কে জানে ফাঁসির আসামীও গলায় দড়ি পরাবার আগে এ-রকম বোধ করে কি-না। জানবার উপায় নেই। জল্লাদ নিশ্চয়ই দড়ি পরাবার আগে জিজ্ঞেস করে না, ভাই আপনার কেমন লাগছে?

অনিবার্য নিয়তি যে কত বিচিত্র ধরনের হতে পারে তার একটি ঘটনা বলি।

ঘটনাটা ঘটে রামপুরা রেলওয়ে ক্রসিং-এ আজ থেকে দু'বছর আগে। ভোরবেলা মর্নিং ওয়াকের দলের একটি অংশ রেল লাইন ধরে হাঁটেন। তেমনি একজন মর্নিং ওয়াকে বের হয়েছেন। বয়স চল্লিশের মত। পায়ে স্যান্ডেল। রেল ক্রসিং পার হতে গিয়ে পায়ের পাতা কেমন করে জানি লাইনে আটকে গেল। এমন কোন জটিল ব্যাপার না। পা টেনে বের করা যাবে। আশ্চর্য ব্যাপার! ভদ্রলোক পা টেনে বের করতে পারলেন না। আশেপাশে লোক জমে গেল। তারাও চেষ্টা করল — লাভ হল না। কিছুতেই পা বের হচ্ছে না।

ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল — চিটাগাংগামী আন্তঃনগর ট্রেন প্রভাতী ছুটে আসছে। ভদ্রলোক প্রাণপণ চেষ্টা করলেন এবং এক সময় বুঝলেন চেষ্টা করে লাভ নেই। — ছুটে আসছে অনিবার্য নিয়তি। তিনি পা পেতে দিয়ে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এই ভদ্রলোকের মত আমরাও সবাই কি অনিবার্য নিয়তির জন্যে অপেক্ষা করছি না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজিতে লেখা একটি চিঠি পেয়েছি। হাতের লেখা যেমন চমৎকার, ইংরেজিও খুব সুন্দর। চিঠির শেষে নাম নেই, শুরুতেই তার জন্যে পত্র লেখিকা ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন — আমি মোটামুটি সম্মানজনক একটি চাকরি করছি। আমার বয়স ৪০। আমার আদি নিবাস বিহার প্রদেশে। মোহাজের হয়ে বাবা-মা-ভাইবোন সহ ১৯৫০ সনে তদানীন্তন পাকিস্তানের সৈয়দপুরে চলে আসি ।

একটি দীর্ঘ চিঠি। ভদ্রমহিলা জানাচ্ছেন, তিনি সাপ্তাহিক বিচিত্রায় আমার এক সাক্ষাৎকারে পড়েছেন যে, আমি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দীর্ঘ একটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা নিয়েছি। তিনি চাচ্ছেন যেন সেই উপন্যাস একপেশে না হয়। যেন বিহারী মোহাজেরদের কথা লেখা হয় — যারা একটি দেশ ছেড়ে অন্য একটি দেশে এসেছিল, সেই দেশও তাদের রইল না। পাকিস্তানও তাদের দেশ নয়। এখন তারা এমন এক মানবগোষ্ঠী যাদের কোন দেশ নেই।

এই পত্রলেখিকা জেনেভা ক্যাম্পে তিন মাস ছিলেন। তিনি সেই তিন মাসের অভিজ্ঞতা এবং জেনেভা ক্যাম্পে আসার আগের অভিজ্ঞতা, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর এবং তাঁর পরিবারের অভিজ্ঞতা খোলাখুলি বর্ণনা করেছেন। যেই অভিজ্ঞতার কিছু কিছু অংশ ভয়াবহ। বর্ণনাতীত।

চিঠির শেষ পর্যায়ে তিনি লিখছেন — প্রিয় লেখক, আমি কিছুই আপনার কাছে গোপন করি নি। সব লিখলাম এই আশায়, যখন আপনি লিখবেন তখন আমাদের কথাও মনে রাখবেন। আপনারা একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছেন — আমরা কি পেলাম?

চিঠিতে কোন ঠিকানা নেই বলে আমি চিঠির জবাব দিতে পারি নি। এই লেখায় জবাব দিচ্ছি। জানি না তিনি পড়বেন কি-না। না পড়লেও আমার মনের শান্তির জন্যে চিঠিটার জবাব দেয়া দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভদ্রমহিলাকে জানাচ্ছি যে, তাঁর চিঠি আমি গভীর মমতা এবং গভীর বেদনার সঙ্গে পড়েছি। যে অন্যায় তাঁর উপর এবং তাঁর পরিবারের উপর করা হয়েছে তার জন্যে আমি এ-দেশের মানুষের হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সেই সঙ্গে তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, সমগ্র জাতির উপর যখন পাকিস্তানী মিলিটারী নির্মম অত্যাচার শুরু করেছে তখন মোহাজের বিহারীদের আমরা পাশে পাই নি। তাঁরা যোগ দিয়েছেন হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। অথচ তাঁরা বাংলাদেশের জল-হাওয়ায় বড় হচ্ছেন। মাটি আমাদের মা। তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন মায়ের সঙ্গে। এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি তো পেতেই হবে। ভয়াবহ দুঃসময়ে সব এলোমেলো হয়ে যায়। একজনের অপরাধে দশজন নিরপরাধী শাস্তি পায়। আমরা বাঙালিরা কোন অপরাধ না করেই কঠিন শাস্তি পেলাম। তাঁরাও খানিকটা পেয়েছেন। আমাদের চরম দুঃসময়ের কথা মনে করে তাঁরা তাদের পুরানো ব্যথা ভোলার চেষ্টা করবেন — এই কামনাই করছি।

দেশ স্বাধীন হয়েছে অনেক দিন হল। পদ্মা, মেঘনায় অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে — ১৯৭১-এর স্মৃতি সেই বিপুল জলরাশি মুছে ফেলতে পারে নি। পত্রলেখিকা তাঁর জীবনের ভয়ংকর কিছু সময়ের কথা লিখেছেন — আমিও খানিকটা লিখলাম। এই লেখাটায় ঈশপের গল্পের মত শেষের দিকে একটু চমক আছে। আশা করি পত্র- লেখিকা সেই চমকটি ধরতে পারবেন এবং আমার দুঃখের তীব্রতা খানিকটা হলেও বুঝবেন —

জায়গাটার নাম 'গোয়ারেখা'।

পিরোজপুর শহর থেকে পনেরো-ষোল মাইল দূরের অজ পাড়া গাঁ। নদীর পাশে ছোট্ট গ্রাম। নদীর নাম মনে নেই — বলেশ্বর বা রূপসা হতে পারে। নদী যেমন সুন্দর গ্রামটা তার চেয়েও সুন্দর। নারিকেল আর সুপারি গাছ দিয়ে অতি যত্নে কেউ যেন এই গ্রাম সাজিয়ে দিয়েছে। ভরা বর্ষা — থৈ থৈ করছে নদী। জ্যোৎস্না রাতে আলোর ফুল ঝরে ঝরে পড়ে। কিছু ফুল আটকে যায় গাছের পাতায়। সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নদৃশ্যের মত। এই স্বপ্নদৃশ্যে আমি আমার মা এবং ভাইবোনদের নিয়ে বাস করছি। আমাদের মধ্যে কোন স্বপ্ন নেই।

মা ক্রমাগত কাঁদছেন। কারণ খবর পাওয়া গেছে, পাক মিলিটারী আমার বাবাকে হত্যা করেছে। শুধু তাই না, তারা এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে এবং আমার ছোট ভাই জাফর ইকবালকে। দু'জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দু'জনই রাইফেল নিয়ে প্রচুর ছোটাছুটি করেছি। ভেবেছি, পয়েন্ট টু টু বোরের রাইফেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলিটারীদের আটকে দেয়া যাবে। বাস্তবে তা হয় নি। পাক আর্মির গানবোট বিনাবাধায় পিরোজপুরের হুলারহাটে ভিড়েছে। তাদের একটি দল মার্চ করে ঢুকেছে পিরোজপুর শহরে। শুরু হয়েছে ধ্বংস এবং হত্যার উৎসব।

আমরা তখন পলাতক। প্রথমে যেখানে ছিলাম সেখান থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। বিপদজনক মানুষ হিসেবে আমাদের কোথাও জায়গা হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিলেন গোয়ারেখার জনৈক মৌলানা। তিনি সর্ষিনার পীর সাহেবের ভক্ত খাদেম। মনেপ্রাণে পাকিস্তানী। পাকিস্তান যাতে টিকে যায় সেই দোয়া তিনি প্রতি নামাজেই করছেন। তারপরেও আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মা'কে বারবার আশ্বাস দিচ্ছেন — জোর গলায় বলছেন, কোন ভয় নাই। মিলিটারী আপনার ছেলেদের ধরতে পারবে না। উপরে আছেন আল্লাহ পাক, নিচে আমি। আমাকে গুলি না করে তারা আপনার ছেলেদের গুলি করতে পারবে না।

মা তাঁর কথায় খুব ভরসা পাচ্ছেন না। কারণ আশেপাশে মিলিটারী অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। এইসব হত্যাকাণ্ডের খবর আবার মৌলানা সাহেব নিজেই নিয়ে আসছেন এবং আমাদের সবাইকে একত্র করে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলছেন।

'আজ কাউখালিতে বিশটা মানুষ লাইন করে দাঁড়া করেছে। ব্রাশ ফায়ার। সব শেষ।'

'আজ দুইটা মানুষরে খেজুর গাছে তুলে বলল — "জয় বাংলা বোল।" তার পরেই ডিম ডিম গুলি।'

'আজ কুড়াল দিয়ে এক কোপ দিয়ে হিন্দু কম্পাউন্ডারের কল্লা আলাদা করে ফেলেছে।'

হত্যাকাণ্ডের বর্ণনার সময় মৌলানা সাহেবের মুখে এক ধরনের আনন্দময় আভাও দেখতে পাই। আমি কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারি না। ভদ্রলোক নিতান্তই ভালমানুষ। তিনি শুধু যে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন তাই না, কয়েকজন হিন্দু যুবককেও আশ্রয় দিয়েছেন।

হিন্দুদের জন্যে তখন সব পথ বন্ধ। হিন্দু জানলেই দ্বিতীয় কোন কথা বলার সুযোগ নেই — গুলি। হিন্দু পরিবারগুলি বাড়ি-ঘর ছেড়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলে। বর্ষাকালের সাপ-খোপ ভর্তি জঙ্গল। দিন-রাত বৃষ্টি পড়ছে। বর্ণনার অতীত সব দৃশ্য। এরা পালিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতেও পারছে না। যেতে হবে সুন্দরবন হয়ে। নদীতে ঘুরছে মিলিটারী গানবোট। সাহায্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবার জন্য মুক্তিবাহিনী তখনো শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে পারে নি।

আমরা আমার নিজের দেশের অপূর্ব সুন্দর একটি গ্রামে আটকা পড়ে গেছি। পালিয়ে যেতে চাচ্ছি অন্য একটি দেশে। চারপাশে মৃত্যু ঘোরাফেরা করছে। তীব্র আতংকে কাটছে আমাদের দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী।

এই রকম সময়ে গোয়ারেখার মৌলানা সাহেব চিন্তিত মুখে মা'কে বললেন, আপনার ছেলে দু'টাকে সরিয়ে দেয়া দরকার। আর দেরি করা যায় না।

মা চমকে উঠে বললেন, কেন?

'অবস্থা ভাল দেখতেছি না।'

'ভাল দেখতেছেন না কেন ?'

'জোয়ান ছেলেপুলে সব ধরে ধরে মেরে ফেলতেছে।'

'ওদের কোথায় সরিয়ে দিতে চান?'

'এমন জায়গায় সরাব যে মিলিটারী কোন সন্ধান পাবে না।'

'এমন জায়গা কি আছে?'

'অবশ্যই আছে। ওদের রেখে আসব সর্ষিনা পীর সাহেবের মাদ্রাসায়। ওরা মাদ্রাসার হোস্টেলে থাকবে। দরকার হলে ওদের মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেব — জামাতে ছওম ক্লাসে।'

মা বললেন, আপনার হাতে আমি ছেলে দু'টাকে তুলে দিলাম। আপনি যা ভাল মনে করেন . .।

আমরা দু'ভাই লুঙ্গি-পাঞ্জাবী পরলাম। মাথায় দিলাম গোল বেতের টুপি। রওনা হলাম সর্ষিনা। যেতে হবে নৌকায়। পথ মোটেই নিরাপদ না। মিলিটারীর গানবোট চলাচল করছে। আতংকে অস্থির হয়ে যাত্রা। এই নৌকা ভ্রমণ মনে হচ্ছে কোনদিন শেষ হবে না। ইঞ্জিনের বিজবিজ শব্দ হতেই অতি দ্রুত নৌকা কোন খাড়িতে ঢুকিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। মাঝে মাঝে মৌলানা সাহেব বলেন, বাবারা ডাইনে তাকাবা না। আমরা ডাইনে তাকাই না, কারণ তখন ডানে গলিত মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে।

সর্ষিনার পীর সাহেবের আস্তানা চমৎকার। জায়গাটা নদীর তীরে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। মাদ্রাসার ছাত্রদের থাকার জন্যে বিশাল হোস্টেল। পাড়া গাঁ মত জায়গায় বিরাট কর্মযজ্ঞ। আর হবে নাই বা কেন। পাকিস্তানের সব রাষ্ট্রপ্রধানই এখানে এসেছেন। কিছু সময় কাটিয়েছেন।

আমরা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে সর্ষিনা পৌঁছলাম বিকেলে। মাদ্রাসার ছাত্ররা দুধে রুটি ছিঁড়ে চিনি মাখিয়ে খেতে দিল। গপাগপ করে খেলাম। তাদেরকে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলিটারীরা কিছুই বলছে না এ জন্যে তাদের মধ্যে আনন্দ ও উল্লাসের সীমা নেই। তাদের কাছেই জানলাম, পিরোজপুরের সঙ্গে সর্ষিনার পীর সাহেবের সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। ক্যাপ্টেন সাহেব দিনের মধ্যে তিন-চার বার টেলিফোন করেন। অপারেশনে যাবার আগে পীর সাহেবের দোয়া নিয়ে যান। আমরা দু'ভাই মাদ্রাসায় ভর্তি হতে এসেছি শুনে তারা যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করল। আমরা আমাদের পরিচয় প্রকাশ করলাম না।

সঙ্গের মৌলানা সাহেব সন্ধ্যার আগে আগে আমাদের দু'জনকে পীর সাহেবের কাছে উপস্থিত করলেন। পীর সাহেব চারদিকে কিছু লোকজন নিয়ে গল্প করছেন। কাছে যাওয়ার সাহস হল না। শুনলাম, মৌলানা পীর সাহেবকে নিচু গলায় কিছু বলছেন এবং পীর সাহেব রেগে যাচ্ছেন। সব কথা বুঝতে পারছি না। পীর সাহেব বেশির ভাগ কথার জবাব দিচ্ছেন উর্দুতে। আমার বাবার প্রসঙ্গে কি কথা যেন বলা হল। পীর সাহেব বললেন, আমি এই লোকের কথা জানি। বিরাট দেশদ্রোহী। ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। যাও যাও, তুমি চলে যাও।

মৌলানা সাহেব আরো নিচু গলায় সম্ভবত আমাদের দু'ভাই সম্পর্কে কিছু বললেন। পীর সাহেব ভয়ংকর রেগে বললেন — না, না। এদের কেন এখানে এনেছ?

মৌলানা সাহেব আমাদের নিয়ে ফিরে চললেন। কি কথাবার্তা তাঁর হয়েছে তিনি কিছুই ভেঙে বললেন না। নৌকায় করে ফিরছি এবং প্রার্থনা করছি খুব তাড়াতাড়ি যেন চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। অন্ধকারে মিলিটারীরা গানবোট নিয়ে বের হয় না। খোলা নৌকার পাটাতনে বসে আছি। ভরা জোয়ার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ মাঝি বলল — দেহেন দেহেন। তাকালাম। দুটি মৃতদেহ ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। এমন কোন দৃশ্য নয় যে অবাক বিস্ময়ে দেখতে হবে। খুবই সাধারণ দৃশ্য। রোজই অসংখ্য দেহ নদীতে ভাসতে ভাসতে যায়। শকুনের পাল দেহগুলির উপর বসে বসে ঝিমোয়। নরমাংসে তাদের এখন আর রুচি নেই। কিন্তু আজকের মৃতদেহ দুটির উপর শকুন বসে নেই। আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। চোখ ফেরাতে পারছি না। সবুজ শার্ট গায়ে দেয়া ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একজন যুবকের মৃতদেহ। তার গলা জড়িয়ে ধরে আছে সাত-আট বছরের একটি বালিকা। বালিকার হাত ভর্তি লাল কাচের চুড়ি। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে হয়ত পরম নির্ভরতায় এই বালিকা তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আমরা বাস করছি স্বাধীন দেশে। স্বাধীন বাংলাদেশ। এই দেশের সবচে' সম্মানিত, সবচে' বড় পদকটির নাম — স্বাধীনতা পদক। বঙ্গবীর আতাউল গণি ওসমানী, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মুনীর চৌধুরী, রনদা প্রসাদ সাহা, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এই পদক পেয়েছেন।

১৯৮০ সনে, মুক্তিযুদ্ধের ন' বছর পর মহান বিজয় দিবসে রেডিও ও টেলিভিশনের খবরে শুনলাম — স্বাধীনতা পদক দেয়া হয়েছে — সর্ষিনার পীর মৌলানা আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ্‌কে।

হায়, এই দুঃখ আমি কোথায় রাখি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালি মাত্রই প্রবল উৎসাহের সঙ্গে একটি কাজ করে — বিয়ের 'ঘটকালী। যে মানুষটির কোন কাজে উৎসাহ নেই, সাপ্তাহিক বাজারে যান না, ঈদের জামা কেনার জন্যে বাচ্চাদের হাত ধরে বের হন না, তিনিও বিয়ের ঘটকালীতে প্রবল উৎসাহ বোধ করেন। সম্ভবত ঘটকালী করতে গিয়ে নিজের বিয়ের কথা মনে পড়ে, প্রথম জীবনের সুখস্মৃতিতে নস্টালজিক হবার সুযোগ ঘটে বলেই এত উৎসাহ।

আমি নিজে খুব আগ্রহ করে এ-রকম একটি বিয়ে দেই। গ্রামের একটি কলেজে পরীক্ষা নিতে গিয়ে একটি রূপবতী তরুণীকে আমার খুব পছন্দ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ শিক্ষক তখন পি-এইচ.ডি. করতে কেমব্রীজ যাচ্ছে। বউ সঙ্গে নিয়ে যাবার সুযোগ আছে। সে পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে ডেকে বললাম, একটা ভাল মেয়ে দেখেছি। ঠিকানা দিচ্ছি, তুমি মেয়েটিকে দেখে এসো।

সে অবাক হয়ে বলল, আপনি যেখানে ভাল বলছেন সেখানে আমার দেখার কি দরকার? আপনি ব্যবস্থা করে দিন। আপনি যাকে বিয়ে করতে বলবেন আমি তাকেই বিয়ে করব।

আমার প্রতি তার আস্থা দেখে শংকিত বোধ করলাম। চিঠি লিখলাম মেয়ের বাবাকে। মেয়ের বাবা রেজিস্ট্রি ডাকে চিঠির জবাব পাঠালেন। চিঠির ভাষা এরকম —

পরম পূজনীয় স্যার,

ভগবানের আশীর্বাদস্বরূপ আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য পাত্র দেখিয়াছেন — আপনার পছন্দের পাত্রকে আমার দেখার কোনই কারণ নেই। আপনি যদি রাস্তার কোন অন্ধ ভিক্ষুককে আমার কন্যার জন্য স্থির করেন — ভগবানের শপথ, আমি তাহার হাতেই কন্যা তুলিয়া দিব। আমার কন্যাও তাহাতে কোন অমত করিবে না।

শুধু শ্রীচরণে একটি অনুরোধ — বিবাহ অনুষ্ঠানে আপনাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে এবং কন্যা আপনাকে সম্প্রদান করিতে হইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কি সমস্যায় পড়া গেল! কেউ কাউকে দেখল না — এক চিঠিতে বিয়ে? তারপর যদি দেখা যায় তেলে-জলে মিশ খাচ্ছে না তখন কি হবে? স্বামী-স্ত্রীর অশান্তির দায়ভাগের সবটাই কি আমাকে নিতে হবে না?

বিবাহ অনুষ্ঠান গ্রামে হবে। অনেক দূরের পথ — লঞ্চে করে যেতে হয়। আমি তিন কন্যা এবং কন্যাদের মাকে নিয়ে উপস্থিত হলাম। নিজে বিয়ে দিচ্ছি সেই বিয়েতে উপস্থিত থাকব না তা হয় না। তাছাড়া হিন্দু বিয়ের অনুষ্ঠান খুব সুন্দর হয়। বাচ্চারা দেখে আনন্দ পাবে। আগে কখনো দেখেনি —।

শেষরাতের দিকে লগ্ন।

লগ্ন পর্যন্ত পৌঁছার আগেই ভয়াবহ সব ঝামেলা হতে শুরু করল। ঝামেলার প্রকৃতি ঠিক স্পষ্ট হল না। — রাত বারোটার সময় বর এসে আমাকে কানে কানে বলল, স্যার, বিয়ে করব না।

'সেকি?

'পালিয়ে যাব। বন্ধু-বান্ধবরা তা-ই বুদ্ধি দিচ্ছে। এরা অবশ্যি পাহারা বসিয়ে দিয়েছে। ধরতে পারলে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলবে।'

'সত্যি পালাবে না-কি?'

'না পালিয়ে উপায় নেই। আপনি ভাবী এবং বাচ্চাদের প্রিন্সিপাল স্যারের বাসায় পাঠিয়ে দিন। ওদের প্রটেকশনে তারা থাকুক। চলুন, আমরা পালিয়ে যাই। পরে পুলিশ দিয়ে ভাবী এবং বাচ্চাদের উদ্ধার করব।'

'বলছ কি তুমি?'

'সত্যি কথা বলছি। দু'টার সময় লগ্ন। হাতে সময় বেশি নেই। পালিয়ে যেতে হবে একটার দিকে। এদের কিছু বুঝতে দেয়া যাবে না। তবে আমার মনে হয় আঁচ করে ফেলেছে — লাঠি-সোটা নিয়ে তাগড়া তাগড়া ছেলেপুলে ঘুরঘুর করছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।'

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম আসলেই তাই। আমার গা হিম হয়ে গেল। এ কি যন্ত্রণা! কে আমাকে বলেছিল বিয়ের ঘটকালীতে যেতে?

গুলতেকিন হতাশ গলায় বলল, জুতা খুলে ফেল। খালি পায়ে ভাল দৌড়াতে পারবে। অকারণে কি ভয়ংকর সব যন্ত্রণা যে তুমি তৈরি কর। মাঝে মাঝে আমার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করে।

বর যে সত্যি সত্যি পালিয়ে যেতে চাচ্ছে তা তখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। বরের বাবা অতি বৃদ্ধ এক স্কুল শিক্ষক যখন আমাকে বললেন, বাবা আমার ছেলে যে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে এই কাজটা কি ঠিক হবে? হিন্দুমতে লগ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরিয়ে গেলে দুপড়া হয়ে যায়। সেই মেয়ের তো আর বিয়ে হবে না।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথায় আমার কাল ঘাম বের হয়ে গেল। হায় হায় আমি তো একশ' হাত পানির নিচে! বৃদ্ধকে বললাম, আপনি একটা ব্যবস্থা করুন। এটা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।

রাত দু'টার লগ্ন পার হয়ে গেল। ভোর সাড়ে তিনটায় শেষ লগ্ন। বিয়ে হলে ঐ লগ্নে হবে, নয়তো না। মেয়ের বাবা এসে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন — আমি এই ছেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিব না। আমার মেয়ের কপালে ভগবান যা রেখেছেন তাই হবে। এই বলেই তিনি শার্ট গায়ে বের হয়ে গেলেন। আমরা খবর পেলাম, মেয়েটি বিয়ের কারণে সারাদিন উপোস ছিল। এই খবর শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। তার জ্ঞান আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাড়ির মেয়েরা সব চিৎকার করে কাঁদছে।

ইউনুস নবী মাছের পেটে যখন চলে যান তখন সেই মহাবিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে একমনে একটা দোয়া পড়েন, যে দোয়ার নাম দোয়ায়ে ইউনুস। আমি অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একমনে সেই দোয়া পড়ছি — লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সোব্‌হানাকা ইন্নি কুন্‌তু মিনাজজুয়ালেমিন। এমন ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন আগে হই নি। এই বিপদ থেকে বের হবার কোন পথও আমি জানি না। আমার পাশে আছে একদল বাজনাদার। তারা তাদের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সন্ধ্যা থেকে বসে আছে। হিন্দু বিয়ে বাজনা ছাড়া হয় না। খানিকক্ষণ মন্ত্রপাঠের পরপর বাজনা বাজাতে হয়। এই বাজনাদারের ক্ষুদ্র দল বাজনা বাজানোর কোন সুযোগ পায় নি। মনে হচ্ছে পাবেও না। পুরো দলটি অসম্ভব বিষণ্ন। মাথা নিচু করে বসে আছে।

শুধু পুরোহিত তাঁর পোশাক-আশাক পরে মোটামুটি নিশ্চিন্ত মুখে বিয়ের আসরে বসে আছেন। তাঁর সামনে পেতলের নানান ধরনের কাশি-কুশি। তিনিও ঐ জায়গায় সন্ধ্যা থেকে বসে আছেন। নড়েন নি। লগ্ন শেষ না হওয়া পর্যন্ত হয়ত নড়বেন না। আমি ঐ ভদ্রলোকের অসীম ধৈর্য দেখে মুগ্ধ হলাম। ভদ্রলোক যেন মানুষ নন। পাথরের মূর্তি।

লগ্ন শেষ হবার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে বর বলল, আচ্ছা ঠিক আছে বিয়ে করব। টোপর কোথায়?

মেয়ের বাবা বললেন — না। অসম্ভব! আমি ঐ বদ ছেলের হাতে আমার আদরের মেয়েকে দেব না। মেয়ে কেটে রূপশা নদীতে ভাসিয়ে দেব।

লোকজন ধরাধরি করে মেয়ের বাবাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল — মাঠের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে। সেখান থেকেই ভদ্রলোক চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

তাঁর কান্নার শব্দ চাপা পড়ে গেল বাজনায়।

বাজনাদাররা বাজনা বাজাতে শুরু করেছেন।

ক্রমাগত উলু পড়ছে।

বাজনার শব্দ, উলুর শব্দ, মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা কন্যার বাবার কান্নার শব্দ -- সব মিলিয়ে পরিবেশ কেমন যেন হয়ে গেল।

খোলা উঠোনে বিয়ে হচ্ছে। আমগাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে হ্যাজাক লাইট। আমি দূর থেকে দেখছি। কনেকে এনে বসিয়ে দেয়া হল বরের সামনে। মেয়েটিকে আজ আর মানবী বলে ভ্রম হচ্ছে না। আমার কাছে মনে হল ঈশ্বর তাঁর ভাণ্ডারের সমস্ত রূপ অন্তত আজ রাতের জন্যে হলেও মেয়েটির সারা শরীরে ঢেলে দিয়েছেন। হোমের আগুনের পাশে মেয়েটি যেন পদ্মফুল হয়ে ফুটে আছে। শুভ দৃষ্টির আগে স্বামীর দিকে তাকানোর নিয়ম নেই — তবু সে একবার চোখ বড় বড় করে তাকালো স্বামীর দিকে — সেই দৃষ্টিতে ছিল গভীর বেদনা, অনুযোগ এবং তার সতেরো বছরের জীবনের অভিমান!

মেয়ের বাবাকে হাত ধরে ছেলের বাবা নিয়ে আসছেন। ভদ্রলোক আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। গাঢ় স্বরে বললেন, স্যার, আমি দরিদ্র মানুষ। আজ আপনার জন্যে কন্যাদায় থেকে মুক্তি পেয়েছি। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। বলেই এই বৃদ্ধ মানুষ নিচু হলেন আমার পা স্পর্শ করার জন্যে — আমি তাঁকে ধরে ফেললাম। কোমল গলায় বললাম — যান, মেয়ের কাছে গিয়ে বসুন।

সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন — আচ্ছা, এই বাজনাদারগুলি কোত্থেকে জোগাড় করেছে? — এরা এখনো বাজনা বাজাচ্ছে। মন্ত্রপাঠের সময় থামবে না? এরা কি নিয়ম-কানুন কিছু জানে না?

তাকিয়ে দেখি, বাজনাদারের পুরো দলটির যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নেচে নেচে বাজাচ্ছে। তাদের মধ্যে সবচে' বয়স্ক মানুষটির হাতে করতাল। সে রীতিমত লাফাচ্ছে। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না তারা এই জীবনে বাজনা থামাবে।

আমি এই জীবনে অনেক মধুর সংগীত শুনেছি। কর্নেগী হলে শুনেছি পৃথিবী-শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞের কনসার্ট — মোজার্টের ফিফথ সিম্পোনী। লাসভেগাসে লেবোরেটরীর পিয়ানো শুনেছি বিথোভেন — কিন্তু সেদিনের কিছু অখ্যাত গ্রাম্য বাজনাদারদের বাজনার মত মধুর সংগীত এখনো শুনি নি — আর যে শুনব সে আশাও কম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার এক বন্ধু আছেন — পশু-প্রেমিক। রাস্তায় কুকুর কাঁদছে কুঁ-কুঁ করে, তিনি হয়ত যাচ্ছেন রিকশায়; রিকশা থামিয়ে ছুটে যাবেন। চোখ কপালে তুলে বলবেন, হল কি তোর? এই আয়, তু তু তু। তাঁর পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা বিড়ালের গায়ে গরম মাড় ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি সেই বিড়াল নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছুটে গেলেন। ইন্টার্নী ডাক্তার বললেন, এখানে কেন এনেছেন? পশু হাসপাতালে নিয়ে যান।

তিনি বললেন, পশু হাসপাতাল কোথায় আমি চিনি না। প্লীজ ফার্স্ট এইড দিন, আমি পরে পশু হাসপাতাল খুঁজে বের করব।

ডাক্তার ফার্স্ট এইড দিতে রাজি নন।

আমার বন্ধু ফার্স্ট এইড না নিয়ে যাবেন না। চিৎকার, চেঁচামেচি, হৈচৈ। চারদিকে লোক জমে গেল। আমার বন্ধু শার্টের হাতা গুটিয়ে ডাক্তারকে মারতে গেলেন। কেলেঙ্কারি অবস্থা।

মানুষের দুঃখ-কষ্টের প্রতি আমার এই বন্ধু চরম উদাসীন। একবার এক পকেটমার ধরা পড়েছে। কিল-ঘুসি-লাথি মেরে তার অবস্থা এমন যে এখন যায় তখন যায় অবস্থা। সে ক্ষীণ স্বরে বলছে — আমারে একটু পানি দেন। এক ফোঁটা পানি।

আমার বন্ধু কঠিন গলায় বললেন, হারামজাদার মুখে কেউ প্রস্রাব করে দিন তো।

তাঁর বাসায় ভিক্ষা চাইতে এসে ভিখিরি প্রচণ্ড লাথি খেয়েছিল। তাঁর ক্লাস টেনে পড়া মেয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির ছেলের সঙ্গে গল্প করছিল। এটা জানার পর তিনি মেয়েকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। আধ ঘণ্টা পর মেয়ে যখন কাঁদতে কাঁদতে বের হল তখন দেখা গেল তার মাথার সব চুল কেটে ফেলা হয়েছে। অল্প কিছু চুল কোট ব্রাশের মত খাড়া হয়ে আছে। আমার এই বন্ধুর ভালবাসা পশু সমাজের জন্য।

আমি আমার বন্ধুর মত নই। কুকুরের প্রভুভক্তির অসংখ্য গল্প জানা থাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্ত্বেও কুকুর দেখলে ভয় ছাড়া অন্য কোন মানবিক আবেগ আমি বোধ করি না। বিড়াল প্রাণী হিসেবে খুব সুন্দর। সেই বিড়ালকে একবার দেখলাম রক্তাক্ত ইঁদুর মুখে নিয়ে ঘুরছে। বিড়ালের ধবধবে শাদা মুখে লাল রক্তের ধারা। আমি সেই থেকে বিড়াল পছন্দ করি না।

আমার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে বিড়ালের কোন মাথাব্যথা থাকার কথা না। তারা যখন-তখন আমার শহীদুল্লাহ হলের বাসায় আসে। খাবার টেবিল থেকে মাছ নিয়ে পালিয়ে যায়। আদর্শ বিড়ালের মত মাছের কাঁটায় তারা সন্তুষ্ট নয়। আমি বিড়াল দেখলেই দূর-দূর করি। ওরা নানান ভাবে আমার সঙ্গে খাতির করার চেষ্টা করে। হয়ত বই পড়ছি — চুপি চুপি এসে পায়ের সঙ্গে গা ঘসে গেল। লাথি মারবার আগেই পালিয়ে গেল।

স্ত্রীরা স্বামীদের অধিকাংশ অভ্যাস গ্রহণ করে ফেলে (যদিও তারা কখনো তা স্বীকার করে না)। গুলতেকিনও সেই ফর্মূলায় বিড়াল অপছন্দ করে। আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায় বিড়ালের জন্য এই বাড়ি মোটামুটি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এরা তবু আশা ছাড়ে না। মাঝে-মধ্যে আসে। দুঃখিত চোখে আমাদের দেখে চলে যায়।

এক রাতের ঘটনা। বসে বসে লিখছি। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হওয়ায় শীত শীত লাগছে। আমি গুলতেকিনকে বললাম একটা চাদর দিতে। সে চাদরের জন্যে কাবার্ড খুলে চেঁচিয়ে উঠল। এক অতি রুগ্‌ণ বিড়াল কাবার্ডের ভেতর বাচ্চা দিয়ে বসে আছে। এতটুকু টুকুন চার বাচ্চা কুঁ কুঁ শব্দ করছে। কাবার্ডের সমস্ত কাপড় নোংরা। বিশ্রী অবস্থা!

গুলতেকিন বলল, এখন কি করব? আমি বললাম, রাতটা কাটুক। ভোরে ফেলে দেয়া যাবে। খুব পাষাণহৃদয় মানুষের পক্ষেও বাচ্চাসহ একটা বিড়াল ফেলে দেয়া কঠিন। আমাদের এই অপ্রিয় দায়িত্ব পালন করতে হল না।

আমার ছোট মেয়ের বান্ধবী পাশের ফ্ল্যাটের জেনিফার ভোর বেলাতেই একটা জুতার বাক্স নিয়ে উপস্থিত। সে গম্ভীর গলায় আমাকে বলল, চাচা, আমাদের বিড়ালটা না-কি আপনাদের বাসায় বাচ্চা দিয়েছে?

'একটা বিড়াল বাচ্চা দিয়েছে জানি। তোমাদের বিড়াল কি-না তাতো জানি না। তোমাদের বিড়াল চেনার উপায় কি?'

'ওর নাম লুসিয়া।'

'নামে তো মা ঠিক চিনতে পারছি না।'

'ওর খুব স্লীম ফিগার।'

'স্লীম ফিগার হলে তোমাদেরই বিড়াল। তুমি পরীক্ষা করে দেখ। কাবার্ডের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতর আছে।'

কাবার্ড খোলা হল। লুসিয়াকে পাওয়া গেল না। বাচ্চা চারটা আছে। এখনো চোখ ফুটে নি।

জেনিফার বলল, চাচা, আমি এদের আমাদের বাসায় নিয়ে যাব।

আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললাম, অবশ্যই নিয়ে যাবে মা, অবশ্যই নিয়ে যাবে। তোমাদের বিড়াল অন্যের বাসায় বাচ্চা মানুষ করবে এটা কোন কাজের কথা না। সম্মান হানি হবার মত কথা।

জেনিফার জুতার বাক্সে বিড়ালের বাচ্চা তুলে নিয়ে গেল। আমি নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, বাঁচা গেল।

সে রাতের ঘটনা। বারান্দায় বাতি জ্বালিয়ে আমি পরীক্ষার খাতা দেখছি। অনেক খাতা জমে আছে। প্রতিজ্ঞা করে বসেছি ত্রিশটা খাতা না দেখে ঘুমুতে যাব না। খাতাগুলি দেখতে খুব সময় লাগছে। রাত একটার মত বেজে গেল। পুরো বাড়ি ঘুমে অচেতন। আমি জেগে আছি। ফ্লাস্ক ভর্তি চা আমার সামনে রেখে দেয়া।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে লুসিয়া লাফিয়ে আমার টেবিলে উঠে এল। আমার দিকে তাকিয়ে রাগী ভঙ্গিতে ম্যাঁ ম্যাঁ করে কি–সব বলল। বিড়ালের ভাষা আমার বোঝার কোনই কারণ নেই। তবু তার ভঙ্গি, তার চিৎকার শুনে মনে হল, সে বলতে চাচ্ছে — আমি আমার অবোধ শিশুগুলিকে তোমাদের ঘরে রেখে খাবারের সন্ধানে গিয়েছিলাম। তোমরা এদের সরিয়ে দিয়েছ। যে কাজটা করেছ, তা অন্যায়। আমি তোমার কাছে কৈফিয়ত দাবী করছি। তোমাকে জবাবদিহি করতেই হবে।

আমার কি যে হল — বিড়ালকে বললাম, যা, তুই তোর বাচ্চাগুলিকে নিয়ে আয়। আমি আর কিছু বলব না। বিড়াল খানিকক্ষণ চুপ থেকে নরম স্বরে বলল,

'ম্যাঁও ম্যাঁও ম্যাঁও (সত্যি কি আনতে বলছেন?)'

'হ্যাঁ।'

'ম্যায়াও মি ম্যায়াও (আনলে তাড়িয়ে দেবেন না তো?)'

'না।'

বিড়াল নেমে গেল। কিছুক্ষণ পর একটা বাচ্চা মুখে নিয়ে টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠল। সে যে আমার কথা বুঝে এই কাণ্ড করেছে এটা মনে করার কোনই কারণ নেই। তবু আমার কেন জানি মনে হল বিড়াল বাচ্চাটা মুখে করে এনে লাফিয়ে আমার টেবিলে উঠেছে একটি কারণে। আমার চূড়ান্ত অনুমতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাচ্ছে।

'ম্যাঁও ম্যাঁও। [কি, রাখব আমার সোনামণিদের?]'

'হ্যাঁ, রাখ।'

'ম্যাঁয়াও ম্যাঁয়াও [তোমার স্ত্রী আবার আপত্তি করবে না তো?]'

'না। তাকে আমি বুঝিয়ে বলব।'

'ম্যাঁয়াও [ধন্যবাদ স্যার।]'

বিড়াল বাচ্চা নিয়ে কাবার্ডের ভেতর ঢুকে গেল। অন্য বাচ্চাগুলিকেও একে একে নিয়ে এল। আমি তাকে বললাম, একটা শর্ত মনে রাখবে। এরা একটু বড় হলেই তুমি আমার বাসা ছেড়ে চলে যাবে। আমি বিড়াল পছন্দ করি না।

'ম্যায়াও (আচ্ছা।)'

ভোরবেলা আমি গুলতেকিনকে ঘটনাটা বললাম। তার ধারণা হল পুরো ব্যাপারটি আমার বানানো। ধারণা করাই স্বাভাবিক। তার সঙ্গে আমার কথাবার্তার সত্তুর ভাগই থাকে বানানো। আমি খুব গুছিয়ে সত্যের মত করে মিথ্যা বলতে পারি।

আমি গুলতেকিনকে বললাম, বিড়ালটা কথা দিয়েছে তার বাচ্চাগুলি একটু বড় হলেই সে চলে যাবে।

'তোমাকে সে কথা দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। মানুষ কথা দিয়ে কথা রাখে না কিন্তু পশুরা একবার কথা দিলে কথা রাখে।'

'তুমি তো মনে হচ্ছে অবতারের পর্যায়ে পৌঁছে গেছ। পশুদের ভাষা বুঝতে পার।'

'তোমার সঙ্গে এক হাজার টাকা বাজি — বাচ্চাগুলি একটু বড় হলেই সে চলে যাবে।'

'বেশ যাও, হাজার টাকা বাজি।'

গুলতেকিন বিড়ালটার জন্য দৈনিক এক পোয়া দুধ বরাদ্দ করে দিল। উচ্ছিষ্ট মাছ মাংস তাকে প্লেটে করে দেয়া হতে লাগল। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। যে রাজকীয় হালে তাকে রাখা হচ্ছে সে তো আর এই বাড়ি ছেড়ে যাবে না। আমাকে বাজিতে হারতে হবে।

কিম আশ্চর্যম! বাচ্চা চারটি একটু বড় হতেই বিড়াল এদের নিয়ে চলে গেল।

আমি অবশ্যি বাজির টাকা পেলাম না। কারণ গুলতেকিন তখন যুক্তি দেখাল, তোমাকে কথা দিয়েছে বলে তো আর সে যায় নি। বাচ্চারা বড় হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— পৃথিবীতে বাস করার ট্রেনিং দেবার জন্যে সে এদের নিয়ে চলে গেছে। তার কথা যে সত্যি তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এর পর মজার ঘটনা ঘটতে লাগল। আশেপাশের যত বিড়াল আছে তারা গর্ভবতী হলেই আমাদের বাসায় চলে আসে। বাচ্চা দেয়। বাচ্চাগুলি একটু বড় হলে এদের নিয়ে চলে যায়। কালো বিড়াল, ধলা বিড়াল, হলুদ বিড়াল। এর মধ্যে একটা ছিল ডাকাতের মত দেখতে।

আমার ধারণা লুসিয়া সমস্ত বিড়াল সমাজের কাছে প্রচার করেছে — হুমায়ূন স্যারের বাসা মেটারনিটি ক্লিনিক হিসেবে অতি উত্তম। এরা যত্ন-আত্তি করে। দুধ খেতে দেয়। শুধু একটা শর্ত, বাচ্চারা বড় হলে বাসা ছেড়ে দিতে হবে।

আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। একবার তিনটা বিড়াল এক সঙ্গে বাচ্চা দিল। বাচ্চা দিয়েই এরা চুপ করে থাকে না। প্রতিদিন বাচ্চাগুলিকে জায়গা বদল করায়। এই দেখলাম খাটের নিচে, খানিকক্ষণ পরই ট্রাংকের কোণায়। ক্ষিধে পেলে এরা গুলতেকিনের শাড়ির আঁচল কামড়ে ধরে টেনে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

আমি পশু-প্রেমিক নই বলেই একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। দেড় হাজার টাকায় নেট কিনে মিস্ত্রি লাগিয়ে দরজা-জানালা, ফাঁক-ফোকর সব নেট দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে দীর্ঘ ছ' বছর পর প্রথম "বিড়াল মুক্ত দিবস" পালন করলাম।

আমার নিয়ম হচ্ছে গভীর রাতে যখন হলের ছেলেরা বেশির ভাগ ঘুমিয়ে পড়ে তখন গুলতেকিনকে নিয়ে হলের সামনের মাঠে হাঁটাহাঁটি করা। সে রাতেও তাকে নিয়ে বের হয়েছি। চাঁদনি পহর রাত। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় হাঁটতে অপূর্ব লাগছে। সাধারণত হাঁটাহাঁটির সময় আমি প্রচুর বকবক করি। সে রাতে কেন জানি চুপ করে আছি — গুলতেকিন বলল, তুমি চুপ করে আছ কেন? ঘর নেট দিয়ে বন্ধ করে দেয়ায় তোমার কি মন খারাপ লাগছে?'

আমি বললাম, হ্যাঁ, লাগছে।

'নেট খুলে দিতে চাও?'

'না।'

'না কেন?'

আমি শান্ত গলায় বললাম, আমি পশু-প্রেমিক নই গুলতেকিন। সামান্য মন খারাপকে আমি প্রশ্রয় দিতে চাই না।

মন খারাপটা অবশ্য খুব সামান্য ছিল না। সে রাতে কিছুতেই আমার ঘুম এল না।

রাত তিনটা পর্যন্ত চুপচাপ জেগে রইলাম। কিছুতেই ঘুম আসে না। ঘুম এল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফজরের আজানের পর। ঘুম ভাঙল সকাল দশটায়। বিছানা থেকে নেমে দেখি সব নেট খুলে ফেলা হয়েছে। কে খুলল, কার নির্দেশে খুলে ফেলা হল কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না। আমি এবং গুলতেকিন দু'জনই এমন ভাব করতে লাগলাম যেন এই প্রসঙ্গ আলোচনার যোগ্য কোন প্রসঙ্গ না। রাতে টিভি দেখছি। আমার মেজো মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, আব্বু গেস্ট রুমে আরেকটা বিড়াল এসে বাচ্চা দিয়েছে। এইবারের বাচ্চাগুলি কালো রঙের। কুচকুচে কালো।

আমি মহা বিরক্ত হয়ে বললাম, এ তো বড় যন্ত্রণা হল! এরা পেয়েছেটা কি? অসহ্য। এই বাড়িতে আর থাকা যাবে না। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি গুলতেকিন জানালা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা করছে। *

---

* আমাদের এই বিড়াল পরিবার নিয়ে আমি 'বিপদ' নামে একটি উপন্যাস লিখেছি। উদ্ভট জাতীয় গল্প যারা ভালবাসেন তারা অন্যের কাছ থেকে বই ধার করে পড়ে দেখতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকালকার ছেলেমেয়েরা আত্মকাহিনীমূলক রচনা শেখে কি–না জানি না তবে আমাদের সময় এ জাতীয় রচনা প্রচুর শিখতে হত। নদীর আত্মকাহিনী, একটি বটগাছের আত্মকাহিনী, চোরের আত্মকাহিনী ইত্যাদি। "একের ভেতর তিন" নামক একটি গ্রন্থ থেকে আমি বেশ কয়েকটি আত্মকাহিনী মুখস্থ করে ফেলি। এর মধ্যে 'একটি চোরের আত্মকাহিনী'টি খুব করুণ করে লেখা। চোর বলছে, সবাই তাকে মারছে। লোকজন ভিড় করে আছে। সে হঠাৎ শুনল একটি বাচ্চা মেয়ে বলছে, বাবা আমি চোর দেখব। তাকে চোর দেখানো হল। মেয়েটি বলল, আরে এ চোর কোথায়? এ তো মানুষ! এই শুনে চোর আত্মগ্লানিতে জরজর

এই রচনার মোর‍্যাল হচ্ছে — চোরও মানুষ। অন্য দশজনের থেকে আলাদা কিছু নয়। এই তথ্য জানার পরও 'চোর' শুনলেই আমাদের গলা বাড়িয়ে দেখার আগ্রহ হয়। আমরা কি দেখতে চাই? আগ্রহের কারণটা কি? আমরা কি দেখতে চাই — লোকটা কোন–না–কোন ভাবে একটু আলাদা কি–না?

বরিশাল থেকে স্টীমারে ঢাকা আসছি। হঠাৎ শুনলাম এই স্টীমারে করেই একজন ভয়ংকর খুনীকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভয়ংকর খুনী দেখতে একজন ভাল মানুষের চেয়ে খুব–একটা আলাদা হবে না জেনেও দেখতে গেলাম। ২১/২২ বছরের একটি যুবক। তিনজন পুলিশ তাকে ঢাকা নিয়ে যাচ্ছে। যুবকটির কোমরে দড়ি বাঁধা, লুঙ্গি পরা, সবুজ রঙের শার্ট। হাসিমুখে চা খাচ্ছে।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে গভীর দৃষ্টিতে যুবকটিকে দেখছি। কোন রকম অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে আছে কি–না তা ধরার চেষ্টা। সে শব্দ করে হাসছে। পা নাচাচ্ছে। পুলিশ তিনজনের সঙ্গে রসিকতা করছে — তার চরিত্রে বা চেহারায় কোন রকম অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করলাম না। এই মানুষটা চারটা খুন কিভাবে করল সেও এক রহস্য। খুন করতে মানসিক শক্তি যেমন প্রয়োজন শারীরিক শক্তিও প্রয়োজন। এই যুবকটি নিতাঁন্তই দুবলা পাতলা।

সে এখন সিগারেট ধরিয়ে টানছে। পুলিশ তিনজন তার সঙ্গে সিগারেট টানছে। সে হাসিমুখে বলল, ওস্তাদজী একটু হাঁটব। পায়ে ঝিঁঝি ধরছে। পুলিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনরকম আপত্তি করল না। একজন তার কোমরের দড়ি ধরে পেছনে পেছনে যাচ্ছে। অন্য দু'জন বসে আছে উদাসদৃষ্টিতে।

পুলিশ তিনজনের সঙ্গে যুবকটির মনে হচ্ছে বেশ সুসম্পর্ক। সে যা বলছে, পুলিশ তাই করছে।

আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত যুবকটির পেছনে পেছনে যাচ্ছি। সে কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়াচ্ছে না। সারা স্টীমার ঘুরে আবার আগের জায়গায় ফিরে এসে বলল, ওস্তাদজী সিগারেট।

বসে-থাকা পুলিশ তার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট দিল, এবং নিজেই ধরিয়ে দিল। চমৎকৃত হবার মত দৃশ্য। পরে বুঝলাম, এই দামী সিগারেট যুবকটিরই কেনা। পুলিশ তার সিগারেটের জিম্মাদার।

আমি যুবকটির চোখ দেখতে চাচ্ছি। সরাসরি তাকাতে চাচ্ছি তার চোখের দিকে। একজন মানুষের ভেতরটা নাকি চোখের মাধ্যমেই দেখা যায়। একটা মানুষ ভাল কি মন্দ, সৎ-অসৎ, তা না-কি তার চোখ বলে দেয়। কিন্তু যুবকটির চোখ আমি দেখতে পাচ্ছি না। তার দৃষ্টি কোথাও স্থির হয়ে পড়ছে না। এক সময় সে তাকাল আমার দিকে। আমার মনে হল তার চোখে অন্য এক ধরনের আলো। সাপের দৃষ্টির মত দৃষ্টি। পরক্ষণেই এই ধারণা মন থেকে মুছে ফেললাম। লোকটি খুনী, আগেভাগে তা জানি বলেই আমি তার চোখের দৃষ্টি সাপের দৃষ্টি বলে ভাবছি। সাপের দৃষ্টি কেমন তাও তো জানি না। সাপের চোখের দিকে তো আমি কখনো তাকাই নি।

খুনীদের সম্পর্কে আমার খানিকটা কৌতূহল আছে। এই কৌতূহলের কারণ হল, খুব ছোটবেলায় আমাদের বাসায় একজন জ্যোতিষী এসেছিলেন। তিনি আমার সব ভাইবোনের হাত দেখে অনেক ভাল ভাল কথা বললেন। আমার হাত দেখে বললেন, এই ছেলে "তিনটি বিবাহ করবে।" আমার মা'র মুখ শুকিয়ে গেল। আমি অবশ্যি যথেষ্ট পুলক অনুভব করলাম। অতঃপর জ্যোতিষী বললেন, চন্দ্রের ক্ষেত্রে যব চিহ্ন — এই ছেলে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারবে। আমার মা নিশ্চিত হলেন যে জ্যোতিষী কিছুই জানে না। সে যদি বলতো — আমি দেশের রাজা হব। মা ধরে নিতেন ঐ জ্যোতিষী খুবই বড় জ্যোতিষী। শৈশবে জ্যোতিষীর কথা আমাকে খানিকটা হলেও পীড়িত করেছে। আমি মানুষ খুন করব — এই ধারণা আমার কাছে খুব রুচিকর মনে হয় নি। এক সময় নিজেই এ জাতীয় আদিভৌতিক বইপত্র পড়তে শুরু করলাম। আমার উৎসাহ ছিল খুনীদের লক্ষণ বিচারে। একটা বই-এ দেখলাম, খুনীদের বৃদ্ধাঙ্গুল হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাটো এবং মোটা। এর পর থেকে কারো সঙ্গে দেখা হলেই তার বুড়ো আঙ্গুলের দিকে তাকাতাম। কারো আঙ্গুল একটু মোটা দেখলেই মনে মনে ভাবতাম, পাওয়া গেছে। এইবার ধরেছি। ব্যাটা খুনী।

লক্ষণ বিচারে মারাত্মক খুনী যাকে পাওয়া গেল সে আমাদের বাসায় কাঠের কাজ করতে এসেছিল। মানুষটা এতই মধুর স্বভাবের যে তাকে খুনী ভাবতেও খারাপ লাগে। উপায় নেই। খুনী তো বটেই। এই মোটা বুড়ো আঙ্গুল।

মেট্রিক পরীক্ষার পর তিন মাস সময় পাওয়া যায়। এই তিন মাস রেজাল্টের জন্যে অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই — আমি তিন মাস নষ্ট করলাম জ্যোতিষী এবং এস্ট্রনমির বই পড়ে পড়ে। বাসায় এ-জাতীয় বই-এর কোন অভাব ছিল না। এক সময় হাত দেখাও শুরু হল —। হাত দেখা, সেই সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিবেচনা করা। দ্বিতীয়টি বেশ কঠিন। কিছুদিন চেষ্টা করে বাদ দিয়ে দিলাম। হাত দেখা বজায় রইল। অল্পদিনেই বুঝে গেলাম — বড় পামিস্ট হিসেবে নাম করা অত্যন্ত সহজ কাজ। হাত দেখাতে যে আসে সে নিজের সম্পর্কে কিছু কিছু জিনিস শুনতে চায়। কি শুনতে চায় তা নিজের অজান্তেই প্রকাশ করে ফেলে। যে সব জিনিস শুনতে চায় সে সব শুনিয়ে দিলেই সে পামিস্ট সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

মহসিন হলে থাকাকালীন সময়ে আমার হাত দেখা বিদ্যার (!!) পূর্ণ বিকাশ ঘটল। দূর-দূর থেকে অচেনা মানুষজনও আসতেন এবং বিনীত গলায় বলতেন, আপনার নাম শুনে এসেছি — একটু যদি কাইন্ডলি । এঁদের কঠিন মুখে ফিরিয়ে দিতাম। তাই নিয়ম। কয়েকবার ফিরিয়ে দিতে হবে। তারপরেও আসবে তখন একদিন হাত দেখা হবে। যে সব কথা ভদ্রলোক শুনতে চাচ্ছেন তার সবই আমি তাঁকে শুনিয়ে দেই এবং অভিভূত করে বিদায় দেই, কাজটা খুব কঠিন না। নমুনা দিচ্ছি —

আমি ঃ আপনাকে সবাই ভুল বুঝে। আপনি আসলে কি কেউ জানে না।

ভদ্রলোক ঃ ঠিক বলেছেন। সবাই ভুল বুঝে [উদাস হয়ে গেলেন। একই সঙ্গে খুশি। সব মানুষই চায় — তার মধ্যে রহস্য থাকুক।]

আমি ঃ সবচে' বেশি ভুল বুঝে আপনার অতি প্রিয়জনরা।

ভদ্রলোক ঃ খুব কারেক্ট অবজারভেশন। [আরো উদাস, এবং দুঃখি। তবে এই দুঃখে কিছুটা আনন্দ মেশানো।]

আমি ঃ আপনি মানুষ হিসেবে অত্যন্ত উদার যদিও ভাব করেন যে আপনি উদার নন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রলোক ঃ এটা ভাই আপনি দারুণ সত্যি কথা বললেন। ভেতরের কথা বলে ফেলেছেন।

[দারুণ খুশি, সবাই চায় নিজেকে উদার ভাবতে।]

আমি ঃ মানুষের প্রতি আপনার মমতা অপরিসীম। শুধু মানুষ না— পশু-পাখি এদের প্রতিও আপনার অসীম মমতা।

ভদ্রলোক ঃ এটা যখন বললেনই তখন আপনাকে একটা গল্প বলি। বৎসর খানিক আগের কথা। নিউ মার্কেটে গিয়েছি [লম্বা গল্প ফেঁদে বসলেন যেখানে পশুপ্রেমের ব্যাপার আছে।]

আমি ঃ আপনার ভেতর অনুশোচনার ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রবল। কোন একটা অন্যায় করবার পর তীব্র অনুশোচনায় আপনি আক্রান্ত হন। এমনও হয়েছে যে অতি সামান্য অন্যায় কিন্তু সারারাত আপনার ঘুম হল না।

ভদ্রলোক ঃ [অভিভূত। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। ধরা গলায় বললেন —] আমার ফ্যামিলি লাইফ সম্পর্কে বলুন।

বলার ভঙ্গি থেকে ধরতে হবে লোকটি পারিবারিক জীবনে সুখী কি সুখী নয়। শতকরা আশি ভাগ সম্ভাবনা — অসুখী। সুখী মানুষ জ্যোতিষী খুঁজে বেড়ায় না। অসুখী হলে অসুখের কারণটা অর্থনৈতিক কি-না তা লোকটির কাপড়-চোপড় দেখে ধরতে হবে। যদি দেখা যায় কারণ অর্থনৈতিক নয় তাহলে বুঝতে হবে সমস্যা অন্য জায়গায়।

আমি ঃ ভাই কিছু মনে করবেন না। আপনার হাত দেখে মনে হচ্ছে পারিবারিক জীবনে আপনি অত্যন্ত অসুখী, যদিও বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। কেন অসুখী তাও আপনার হাতে আছে। বেশ পরিষ্কার ভাবেই আছে, কিন্তু স্যরি। আমি বলতে চাচ্ছি না। এই বিষয়ে আমি কিছু বলব না। দয়া করে আমাকে জোর করবেন না।

আমাকে তখন আর কিছু বলতে হয় না। ভদ্রলোক নিজেই তখন হড়বড় করে তার জীবন ইতিহাস বলতে থাকেন। এই ব্যাপার আমি একবার না, অসংখ্যবার লক্ষ্য করেছি। মানুষগুলি জেনেশুনে প্রতারিত হবার জন্যে আসে। প্রতারিত হয় এবং হাসিমুখে ফিরে যায়। তার জন্যে আমি তেমন কোন গ্লানিবোধ করি না। তার প্রধান কারণ, এর মধ্যে কোন অর্থ জড়িত নয়। হাত দেখার জন্যে আমি কোন টাকা নেই না। এতটা নামা আমার পক্ষে সম্ভব না। দ্বিতীয় কারণ, পুরো ব্যাপারটায় আমি খুব মজা পাই। মানব চরিত্রের বিচিত্র সব দিক ধরা পড়ে।

অনেকেই হয়ত বলবেন — আপনি হাত দেখতে জানেন না বলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজেবাজে কথা বলে মানুষকে ধোঁকা দেন। যারা জানে তারা দেয় না। হাতে যা আছে তাই বলে। তাঁদের জন্যে আমার একটা গল্প আছে — বছর ছয়েক আগের কথা। সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকার অফিসে গিয়েছি। গল্প করছি রোববার পত্রিকার সম্পাদক কবি রফিক আজাদের সঙ্গে। তখন বাংলাদেশের একজন নামী হস্তরেখাবিশারদ পত্রিকা অফিসে ঢুকলেন। তাঁর নাম করছি না। তাতে তাঁর রমরমা ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে।

রফিক আজাদ আমাকে দেখিয়ে বললেন, উনার হাতটা দেখুন তো।

হস্তরেখাবিশারদ আমাকে চিনলেন না। চেনার কথাও না। তখন পত্র–পত্রিকায় আমার কোন ছবি ছাপা হত না। তিনি গভীর মনোযোগে হাত দেখলেন — এবং বললেন,

'আপনি লেখালেখি করেন।'

সবাই চমৎকৃত হল। আমি হলাম না। পত্রিকার অফিসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। সঙ্গত কারণেই ধরে নেয়া যায় আমি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। আমি তাঁকে কনফিউজ করবার জন্যে খুব শংকিত গলায় বললাম — আমার পড়াশোনা কতদূর হবে একটু দেখুন।

হস্তরেখাবিশারদ আমার টোপ গিললেন এবং আমার করুণভাবে বলার ভঙ্গি থেকে ধরে নিলেন — পড়াশোনার অবস্থা শোচনীয়।

'আপনার রবির ক্ষেত্র বেশ দুর্বল। তাছাড়া বৃহস্পতির ক্ষেত্রও তেমন ডেভেলপড নয়। ব্রেক অব স্টাডি আছে।'

তখন আমি সদ্য পি–এইচ.ডি করে দেশে ফিরেছি। কিন্তু এমন ভাব করলাম যেন তাঁর কথায় অভিভূত হয়ে গেছি। আমার আশেপাশে যারা ছিল তারা আমার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। আমি গলার স্বর আরো করুণ করে বললাম,

'পড়াশোনা বাদ দিন। যা হবার হয়েছে। এর বেশি কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। চাকরি–বাকরি দেখুন।'

ভদ্রলোক আবার আমার টোপ গিললেন এবং বললেন — এখন চাকরির কোন যোগ দেখছি না। তবে বছর দু'একের মাথায় বড় ধরনের একটা সুযোগ আছে। সেই সুযোগ গ্রহণ করলে ভাল হবে।

তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছি। আমি ভদ্রলোকের কথায় এমন আন্তরিক ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলাম যে তিনি চলে এলেন পুরো আমার হাতের মুঠোয়! আমি বললাম, আমার খুব দেশ–বিদেশ দেখার শখ। দেখুন না বিদেশযাত্রা আছে কি–না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শেষ বয়সে সম্ভাবনা আছে।'

এই হচ্ছে পামিস্ট্রি। এই হচ্ছে দেশবিখ্যাত (!!!) হস্তরেখাবিশারদের নমুনা। বিজ্ঞান সম্বন্ধে পড়াশোনা জানা মানুষদেরও আমি দেখেছি এই সব ব্যাপারে অটল ভক্তি। কেউ কেউ পামিস্ট্রি বিশ্বাস করেন না কিন্তু এস্ট্রনমি বিশ্বাস করেন। তাঁদের ধারণা এস্ট্রনমি নাকি সায়েন্স! বৃশ্চিক রাশির সব জাতকের স্বভাব চরিত্র না-কি এক রকম হবে। আমি এবং আমার দুই ভাইবোন বৃশ্চিক রাশির। আমাদের কারোর সঙ্গে কারো স্বভাবের কোন মিল নেই। তার চেয়েও বড় কথা, এইসব রাশির ব্যাপারগুলি হাজার বছর আগের আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র দেখে ঠিক করা। হাজার বছরে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে। আজ যদি কুষ্ঠি তৈরি করা হয় এবং কুষ্ঠি বিচার করে লেখা হয় —

'জাতক জন্মলগ্নে বৃশ্চিক রাশি'

তখন উচ্চস্বরে হাসা ছাড়া পথ নেই। হাজার বছর আগে জন্মালে এই জাতক বৃশ্চিক রাশি হত। আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলি যোগ করলে বৃশ্চিকের মত হয়ত দেখাতো। আজ দেখাবে না। নক্ষত্ররা সরে গেছে।

বাংলাদেশে হস্তরেখাবিশারদের মত অনেক এস্ট্রলজারও আছেন। তাঁদের সমিতি-টমিতি আছে। তাঁরা মহা সম্মেলন করেন। গ্রহ-নক্ষত্র বিচারে দেশের ভবিষ্যৎ কি তা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দেন। পত্রিকাওয়ালারা সেই সব বিবৃতি খুব আগ্রহ করে ছাপেন। বিস্মিত হয়ে ভাবি, কোন যুগে বাস করছি? জাদুটোনার যুগে না চন্দ্র জয়ের যুগে?

এস্ট্রলজারদের মহা সম্মেলনে একবার একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি আমি আগেও এক লেখায় উল্লেখ করেছি। আবারো করছি। যে মহা সম্মেলনটির কথা বলছি সেই মহা সম্মেলনে এরশাদ সাহেবের এক মন্ত্রী ছিলেন প্রধান অতিথি। তিনি তাঁর বক্তৃতায় — মহা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করলেন। এস্ট্রলজাররা গ্রহ-নক্ষত্র গুণে দেশ ও জাতির জন্যে যে মঙ্গল করে যাচ্ছেন তার ভূয়সি প্রশংসা করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে এস্ট্রলজির একটি বিভাগ খোলা উচিত সেই সম্পর্কেও বললেন। ঘন ঘন হাততালি পড়তে লাগল।

তখন তিনি একটি মোক্ষম কথা বললেন। তিনি বললেন, এস্ট্রলজারদের জন্যে তিনি একটি মানমন্দির স্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

এস্ট্রলজাররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এ কি সমস্যায় পড়া গেল! মানমন্দির দিয়ে তাঁরা কি করবেন? কোন্ গ্রহ ভাল কোন্ গ্রহ মন্দ এটা তো মানমন্দির দিয়ে বোঝা যাবে না। মানমন্দির হচ্ছে এস্ট্রানমারদের জন্যে, এস্ট্রো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিজিসিস্টদের জন্যে। তাঁদের প্রয়োজন হাজার বছরের পুরানো পুঁথি — এবং একদল বোকা পাঁঠা জনগুষ্ঠী।

ভাল কথা, শৈশবে যে জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিলেন আমি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারব, তাঁর গণনা কিন্তু এক অর্থে মিলে গেছে। এইসব দিনরাত্রি নামক ধারাবাহিক নাটকে আমি 'টুনী'কে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছি। শুধু টুনী না — আমার উপন্যাসের অনেক চরিত্রকেও অকালে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে । আমি কি করব? আমার হাতে লেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত একটার পর আমি সাধারণত ঘড়ির দিকে তাকাই না। ঘড়ির দিকে তাকালেই এক ধরনের অপরাধবোধে আক্রান্ত হই। ঘুমুতে যাওয়া উচিত — যাচ্ছি না। দুষ্ট ছেলের মত জেগে আছি। একে একে ঘরের সব বাতি নিভে যাচ্ছে। রান্নাঘরের বাতি নিভিয়ে কাজের মেয়েটি ঘুমুতে গেল। চারদিক চুপচাপ। এর আগের রাতও জেগে কাটিয়েছি। আরো কয়েক রাত এমন করে কাটলে পুরোপুরি অনিদ্রায় ধরবে। শরীরের নিজস্ব ঘড়ি যাবে উল্টে। দিনে ঘুমুব, রাতে জেগে থাকব।

গত রাত জেগে কাটিয়েছি বিশেষ কারণে। মন বিক্ষিপ্ত ছিল। তুচ্ছ কারণে মন বিগড়ে গেল। অতি তুচ্ছ বিষয় যা তৎক্ষণাৎ মন থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত ছিল, অথচ ঝাড়তে পারি না। বড় বড় ব্যাপারগুলি সহজেই ঝেড়ে ফেলা যায় কিন্তু তুচ্ছ ব্যাপারগুলি চোরকাঁটার মত। কিছুতেই তাড়ানো যায় না। ঘটনাটা বলি — ছোট্ট একটা ইলেকট্রিক্যাল পার্টস কিনতে গিয়েছি। একটা মাল্টি প্ল্যাগ টিভির পেছনে লাগানো থাকবে। একসঙ্গে এন্টেনা এবং ভিসিআর-এর ইনপুট আসবে। । দোকানে ঢোকামাত্র দোকানি আনন্দে হেসে ফেলে বলল, আরে আপনি! কি সৌভাগ্য!

আমি বললাম, আপনি কি আমাকে চেনেন?

দোকানি চোখ কপালে তুলে বলল, আপনাকে চিনব না? আপনার বহুব্রীহি .

আমি যথেষ্টই আনন্দিত হলাম। জিনিসটা কিনলাম। দাম জিজ্ঞেস করলাম। দোকানি বলল, পৃথিবীর সব মানুষের কাছ থেকে লাভ করা যায়, আপনার কাছ থেকে করা যায় না। আপনার সঙ্গে ব্যবসা করলে অধর্ম হয়। আমি যে দামে কিনেছি সেই দাম দিন। একটা পাই পয়সা বেশি রাখব না। একশ' চল্লিশ টাকা।

আমি একশ' চল্লিশ টাকা দিলাম।

'স্যার চা খান।'

'না, চা খাব না।'

'আপনি আমার দোকান থেকে চা না খেয়ে যাবেন, তা তো হয় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চা এল। আমি চা খেয়ে খুশি মনে রওনা হলাম। মানুষকে অবিশ্বাস করলে ঠকতে হয়। যে সবাইকে বিশ্বাস করে সে কখনো ঠকে না।

আমার কি যে হল — অবিশ্বাসের সামান্য কণা মনে জন্মাল। অন্য একটা দোকানে এই জিনিসটির দাম জানতে চাইলাম। তারা বলল, একশ' টাকা। আরো একটা দোকানে গেলাম। তারাও বলল, একশ'। আমি হতভম্ব। তখন মনে হল — লোকটাকে অবিশ্বাস করেছি বলে ঠকেছি। অন্য কোথাও দাম জিজ্ঞেস না করলে তো ঠকতাম না। চল্লিশ টাকা এমন বড় কিছু নয়।

একবার ভাবলাম, প্রথম দোকানে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করি — ভাই, এই কাজটা আপনি কেন করলেন? সামান্য চল্লিশটা টাকার জন্যে করলেন, না-কি আমাকে বোকা বানানোর জন্যে করলেন?

আমি লোকটির কাছে গেলাম না। প্রচণ্ড রাগ বুকে পুষে ঘরে ফিরে এলাম। রাতে বিছানায় ঘুমুতে গিয়ে মনে হল, ঐ লোক তার স্ত্রীর সঙ্গে নিশ্চয় হাসতে হাসতে গল্প করছে — "আজ আমাদের দোকানে এসেছিল এক বোকা লেখক। ব্যাটাকে মাথা মুড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছি। হা-হা-হা।"

যে মানুষ ঈশ্বরের অংশ তার ভেতর এত ক্ষুদ্রতা কেন? আমি আরো অনেকের মত মানুষকে নিখুঁত প্রাণী হিসেবে ভাবতে ভালবাসি। যদিও খুব ভাল করেই জানি আমার ভেতর অসংখ্য খুঁত আছে। রাগ, লোভ, ঘৃণা, অহংকার সব শুধু যে আছে তাই না — অনেক বেশি পরিমাণে আছে, তবু কেন অন্যের ভেতর এইসব দেখলে এত কষ্ট পাই?

লেখালেখির সময়ও একই ব্যাপার — যে সব চরিত্র তৈরি করি তাদের মানবিক গুণই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তাদের চরিত্রের অন্ধকার অংশের কথা ভাবতে বা লিখতে ভাল লাগে না। লিখতে গেলে মনের উপর চাপ পড়ে।

মানুষকে বড় করে দেখার এই প্রবণতা কি দোষণীয়?

যে যেমন তাকে ঠিক তেমন করেই কি দেখা উচিত নয়? আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয় মানব চরিত্রে এমন সব বড় দিক আছে যার স্পর্শে তার যাবতীয় দোষ, যাবতীয় ত্রুটি ঢাকা পড়ে যায়।

প্রাণী হিসেবে মানুষ অসম্ভব বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান প্রাণীর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, সে কখনো নিজের জীবন বিপন্ন করবে না। সে তার জীবনের মূল্য জানে। এই জীবনকে সে রক্ষা করবে। অথচ কি মজার ব্যাপার, অসম্ভব বুদ্ধিমান প্রাণী হয়েও মানুষ প্রতিনিয়ত প্রকাণ্ড সব বোকামি করে। দাউদাউ করে একটা বাড়িতে আগুন জ্বলছে। বাড়ির ভেতর থেকে ছোট্ট একটা শিশুর কান্না শোনা যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিতান্তই অপরিচিত একজন মানুষ শিশুর কান্না শুনে দৌড়ে আগুনের ভেতর ঢুকে পড়বে। ভয়াবহ বোকামি করে প্রমাণ করবে যে মানুষ শ্রেষ্ঠতম প্রাণী।

আমাদের নানার বাড়িতে নসু বলে একটা লোককে ছোটবেলায় দেখেছিলাম। তার সমস্ত শরীর ঝলসানো। সে আগুনে আটকা-পড়া একটা বিড়াল ছানাকে বাঁচাতে গিয়ে পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছিল। সবাই তাকে ডাকতো বোকা নসু। কিন্তু সেই 'বোকা' ডাকের সঙ্গে কি গভীর মমতাই না মেশানো থাকতো!

ছোটবেলায় আমি ভেবেছিলাম, নসু মামা বোধ করি খুব বিড়াল পছন্দ করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি দাঁত-মুখ কুঁচকে বললেন, "দূর ভাইগনা। বিলাই আমার দুই চউক্ষের বিষ।"

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই "দু'চোখের বিষের বাচ্চা" বাঁচানোর জন্যেও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। মানুষ বলেই সে পারে। মানুষকে চেষ্টা করে মহৎ হতে হয় না, মহত্ত্ব নিয়েই সে জন্মেছে।

আমার মন যখন বিক্ষিপ্ত থাকে তখন কিছু কিছু লেখকের রচনা পাঠ করি যা আমাকে শান্ত হতে সাহায্য করে। মার্কিন ঔপন্যাসিক জন স্টেইনবেক তেমনি একজন লেখক। মানুষের শুভবুদ্ধির প্রতি তাঁর আস্থা, মানুষের প্রতি তাঁর সীমাহীন মমতা আমাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

১৯৫২ সনে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার নিতে গিয়ে জন স্টেইনবেক যে ভাষণ দিয়েছিলেন আমার কাছে সে ভাষণ দৈববাণীর মত মনে হয়। স্টেইনবেক বলছেন — "আমি মনে করি যে লেখক মানুষের নিখুঁত ও ত্রুটিহীন হয়ে উঠবার সম্ভাবনায় আস্থা স্থাপন করেন না — সাহিত্যের প্রতি তাঁর কোন আনুগত্য নেই। সাহিত্য সদস্য হবার কোন যোগ্যতা তাঁর নেই।"

এই মহান লেখক মানুষের ত্রুটিগুলি এত মমতায় এঁকেছেন যে পড়তে পড়তে বারবার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠে। মনে হয়, বিশ্বাস হারানোর সময় এখনো আসে নি। কখনো আসবেও না।

আমার যখন রাতজাগা রোগ হয় তখন এই লেখকের দু'টি বই খুব আগ্রহ করে পড়ি — একটি হল "ক্যানারী রো"। কয়েকজন ভবঘুরে অলস যুবকের গল্প। অন্যটি "টরটিলা ফ্ল্যাট"। বড়ই মজার, বড়ই রহস্যময় উপন্যাস। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছি, যে গ্রন্থের জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার পান — "গ্রেপস অব র‍্যাথ" তা আমার পড়তে একেবারেই ভাল লাগে নি। একবার শুধু পড়েছি। তাও কষ্ট করে।

এই মহান লেখক তাঁর আত্মজীবনীতে খুব মজা করে একটা ঘটনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছেন। হাতের কাছে বইটি নেই। কাজেই হুবহু অনুবাদ করতে পারছি না — ঘটনাটা বলি। যুবক বয়সে স্টেইনবেকের খুব ইচ্ছে হল আমেরিকার এক মাথা থেকে পায়ে হেঁটে অন্য মাথায় যাবেন। কাঁধে 'হেভার স্যাক' নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় যাত্রা শুরু করলেন। সারাদিন হাঁটেন। রাতে কোন-না-কোন বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। গৃহকর্তা জিজ্ঞেস করেন, তোমার উদ্দেশ্য কি? যাচ্ছ কোথায়?

'আমি পায়ে হেঁটে আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'এম্নি, কোন কারণে না।'

'না, তোমার মতলব সুবিধার মনে হচ্ছে না। থাকতে দেয়া হবে না। অন্য কোথাও যাও।'

অন্য বাড়িতে গিয়েও দেখেন একই অবস্থা। একটা যুবক ছেলে শুধুমাত্র শখের কারণে ছ'হাজার মাইল পায়ে হাঁটবে — এটা কেউ বিশ্বাস করছে না। স্টেইনবেক বলছেন, আমি যখন দেখলাম, মানুষ সত্যটাকে গ্রহণ করতে পারছে না তখন মিথ্যার আশ্রয় নিলাম — আমি বলা শুরু করলাম, বন্ধুর সঙ্গে বাজি ধরেছি। পায়ে হেঁটে আমেরিকার এক মাথা থেকে অন্য মাথায় যাব। তখন সবাই যে শুধু আমার কথা বিশ্বাস করল তাই না, আমাকে নানানভাবে উৎসাহও দিল যাতে আমি বাজি জিততে পারি। স্টেইনবেক বলছেন, "মানব চরিত্রের একটি মজার দিক হচ্ছে মানুষ সত্যের চেয়ে মিথ্যাকে সহজে গ্রহণ করে।"

প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছি। প্রসঙ্গে ফিরে যাই — নিশি যাপন বিষয়ে বলছিলাম। আজ রাত জেগে আছি মন খারাপের জন্যে ঘুম আসছে না বলে। কিন্তু আমার মন যখন বেশ ভাল থাকে তখনো আমি মাঝে মাঝে নিশি যাপন করি।

এই পৃথিবীতে সবচে' মহৎ এবং সবচে' ভয়ংকর পরিকল্পনাগুলি না-কি রাতে করা হয়। সাধুরা ঈশ্বর চিন্তা করেন রাতে। কুৎসিততম অপরাধগুলি করতে অপরাধীরা রাতে বের হয়। সাধারণ মানুষদের জন্যে রাত হচ্ছে বিশ্রামের কাল। আর যারা অসাধারণ, রাত তাদের জেগে থাকার সময়। আমি খুবই সাধারণ তবু মাঝে মাঝে অসাধারণ হতে ইচ্ছা করে। রাত জাগতে ভাল লাগে। আমার এই রাতজাগা অভ্যেস ধরিয়ে দেন আনিস সাবেত। মেট্রিক পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া তুখোড় ছাত্র। মহসিন হলে আমার পাশের ঘরে থাকতেন। পদার্থবিদ্যার ছাত্র। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা একটাই — 'ছবি বানাবেন'। পাঠ্যবই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ছবি বানানোর কিছু কোর্স নিলেন। কোন-এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যামেরাম্যানের অ্যাসিসটেন্ট হয়ে ক্যামেরার কাজ শিখতে লাগলেন। তাঁর ছিল রাতজাগা নেশা। এই নেশা তিনি আমাকে ধরিয়ে দিলেন। বাতি-টাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছি। ভোর আটটা থেকে ক্লাস — সকালে উঠতে হবে। আনিস ভাই এসে দরজায় টোকা দিলেন, এই ঘুমুচ্ছ না-কি?

আমি মটকা মেরে পড়ে থাকি, জবাব দেই না।

আনিস ভাই আরো কয়েকবার দরজায় টোকা দিয়ে শেষটায় বলেন — এখন কিন্তু দরজা ভাঙব। ওয়ান-টু-থ্রী

আমি কাতর গলায় বলি, আমার ভোর বেলায় ক্লাস আনিস ভাই ।

'ভোরবেলায় তো আমারো ক্লাস। হু কেয়ার্স?'

'যাবেন কোথায় এত রাতে?'

'প্রথমে নীলখেতে গিয়ে চা খাব, তারপর শহরে হাঁটব।'

শার্ট গায়ে দিয়ে বের হই। নীলখেতে চা খাই তারপর হাঁটতে শুরু করি। সেই সময় রাতের ঢাকা ছিল অসম্ভব নিরাপদ। শহর কখনো ঘুমুতো না। রাস্তা-ঘাটে কিছু-না-কিছু মানুষ থাকতোই। এমনও হয়েছে আমরা সারারাত হেঁটে ভোরবেলা হলে উপস্থিত হয়েছি। চা-নাশতা খেয়ে চলে গিয়েছি ক্লাসে।

দেশের প্রতি প্রচণ্ড মমতা ছিল আনিস ভাইয়ের। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের জন্যে কি করা যায় — কি করে এ দেশের শিল্প-সাহিত্যকে এগিয়ে নেয়া যায় — রাতদিন এই পরিকল্পনা। আহমেদ ছফা'র সঙ্গে যোগ দিয়ে তখন পত্রিকা বের করছেন। দারুণ উৎসাহ। ছবির একটা স্ক্রীপ্ট লিখে ফিললেন । যখন টাকা হবে এই ছবি বানানো হবে। দেশে বিদেশে ছবি যাবে সবাই মুগ্ধ হয়ে বলবে — বাংলাদেশের ছবি। যে দেশের প্রতি এত মমতা সেই দেশের উপর প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে তিনি ১৯৭৫ সনে চিরদিনের জন্যে চলে গেলেন কানাডা। আমার সঙ্গেও যোগাযোগ রাখলেন না। চিঠি লিখি, জবাব দেন না।

আমেরিকা গিয়ে অনেক চেষ্টা করে টেলিফোনে তাঁকে পেলাম। মনে হল, কথা বলায় কোন আগ্রহ বোধ করছেন না। রাগ করে টেলিফোন রেখে দিলাম। সেও অনেক কাল আগের কথা।

তার পরের ঘটনা ভয়ংকর ধরনের। গভীর রাতে টেলিফোন এসেছে। লং ডিসটেন্স কল। আনিস ভাই আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে আমাকে খুঁজে বের করেছেন। টেলিফোন করেছেন রাত তিনটায়। রাগ ভুলে গিয়ে আমি হাসিমুখে বললাম, আপনার পুরানো অভ্যাস এখনো যায় নি। টেলিফোন করেছেন, রাত তিনটায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনিস ভাই হাসতে হাসতে বললেন, ইচ্ছে করে করেছি। তোমার ঘুম নষ্ট করবার জন্যে করেছি। কেমন আছ?

'ভাল। আপনি কেমন?'

'আমি কেমন আছি বলছি, তবে শান্ত হয়ে শুনবে, মন খারাপ করবে না। আমার ক্যানসার হয়েছে। থ্রোট ক্যানসার। কাউকেই বলি নি। তোমাকে বললাম। সময় হাতে বেশি নেই। দু'মাস।'

আমি টেলিফোন হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

শেষ দু'মাসে আনিস ভাই প্রতি সপ্তাহে টেলিফোন করতেন। রাত দু'টা বা তিনটায় টেলিফোন বেজে উঠতো। কথা বলতে তখন তাঁর কষ্ট হত। সব কথা বোঝাও যেত না।

'হুমায়ূন, তোমার কি মনে আছে আমরা কেমন সারারাত শহরে হাঁটতাম?'

'মনে আছে।'

'তুমি কি এখনো হাঁট?'

'না।'

'মৃত্যুর আগে আর একবার শুধু ঢাকা শহরে হাঁটতে ইচ্ছে করে। আমাদের দেশটাকে আল্লাহ এত সুন্দর করে কেন বানালেন বলতো? খুব দেখতে ইচ্ছা করছে।'

'চলে আসুন।'

'চলে আসা সম্ভব নয়। আমার শেষ অবস্থা। তুমি কি কাঁদছ না-কি?'

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, না। আপনি দয়া করে আর আমাকে টেলিফোন করবেন না। আমি সহ্য করতে পারছি না।

আনিস ভাই আমাকে টেলিফোন করেন নি। তাঁর নির্দেশমত হাসপাতাল থেকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ আমাকে দেয়া হয়।

আমি এখনো নিশিযাপন করি। মাঝে মাঝে কেমন জানি লাগে। মনে হয় হারিয়ে যাওয়া মানুষরা যেন হারিয়ে যায় নি — আছে, আমার পাশেই আছে। এই তো ভালবাসা এবং মমতায় তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এমন অনুভূতি কখনো দিনে হবার নয় — তার জন্যে প্রয়োজন চিররহস্যময়ী — রাত্রি। অনন্ত অম্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~